চতুর্থ অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : চরিত্র নির্মাণ

সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে চরিত্র। মধ্যযুগে সৃষ্ট আখ্যান কাব্যগুলির ক্ষেত্রে একথা একেবারে অমান্য করা চলে না। এই সময়ের আখ্যান কাব্যগুলি হল — মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য ও শিবমঙ্গল কাব্য প্রভৃতি। তাতে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সংযুক্তি ও সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রের অন্তর্গহনে দুটি সংস্কৃতির স্বর অনুভব করা যায়। পুরাণ কাহিনীতে বর্ণিত পুরাণ চরিত্রে মানব জীবনের ধূলো মিশ্রিত এবং মানব চরিত্রে লৌকিক জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যগুলিতে বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ পাওয়া যাবে। তাতে চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বমুখর এবং জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পাবে বলে আশা করা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি মধ্যযুগের ধর্মীয় আবহাওয়ায় ও পৌরাণিক আবহমণ্ডলে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূঢ় ও ক্রূর প্রকৃতির। প্রবল অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী করে অঙ্কন করার সামাজিক-ধর্মীয় প্রয়োজন কবিরা অনুভব করেছিলেন। মানব সমাজে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী চরিত্রের সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেব-দেবী চরিত্রের দ্বন্দ্ব স্থাপন করে মানবের পরাজয় উন্মোচন করা কাব্যগুলির প্রথাগত রীতি ছিল। এতে মানব চরিত্রের পরাজয় ঘটলেও তাদের প্রবল ব্যক্তি সত্তার প্রকাশ জলাঞ্জলি হত না। পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের ও পরিবার ধর্মের রীতি-নীতি, আদর্শ ও সতীত্বের ধারণাগুলি বজায় রাখা হত। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ধারাবাহিকতা নিয়ন্ত্রণে, অন্যান্য চরিত্রের মানস পরিবর্তনের, কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র সৃজনে, চরিত্রের মধ্যে আন্ত ঃপরিচয় ঘটাতে, মধ্যযুগের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বাতাবরণ প্রকাশে, সামাজিক বন্ধন সম্পর্কে সচেতন করতে ও রীতি-নীতি উন্মোচনে চরিত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। E. M. Forster তাঁর 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে উপন্যাসের চরিত্র-প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে প্রযোজ্য বলে মনে হয় — "We are concerned with the characters in their relation to other aspects of the novels; to a plot, a moral, their fellow characters, atmosphere, etc. They will have to adapt themselves to other requirements of their creator."[১] চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার প্রথম কবি মানিক দত্ত ছিলেন গায়েন। তিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও প্রতিভাধর স্রষ্টা নন। তাঁর কাব্যে লোক-আকাঙ্ক্ষা, জনমানসের আকর্ষণ, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক বন্ধননীতি চরিত্র চিত্রণে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রণের আগে আমরা চরিত্রের শ্রেণীবিভাগ করে নিতে পারি। টাইপ চরিত্র (Flat Character) ও জটিল চরিত্র (Round Character)। E. M. Forster তাঁর 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে বলেছেন — "We may divide character into flat and round. Flat characters were called 'humours' in the seventeenth century, and are sometimes called types, and sometimes caricatures. In their purest form, they are constructed round a single idia or quality : when there is more than one factor in them, we get the beginning of the curve towards the round."[২] Flat চরিত্রকে 'টাইপ' চরিত্রও বলা হয়। আসলে এই সকল চরিত্ররা সরল। যে সকল চরিত্র পেশা ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ রাজা ইত্যাদি অবস্থার পরিচয় বহন করে, সেই পরিচয়ের বাইরে স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না, তাদের বলা হয় টাইপ বা ফ্ল্যাট চরিত্র। পাশাপাশি যে সকল চরিত্র তার সামাজিক বৃত্তি বা অবস্থানের মধ্যেও কখনো কখনো বিপরীত বা স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে, তাদের বলা যায় Round Character বা জটিল চরিত্র বা Individual Character। এই শ্রেণীর চরিত্ররা তাদের টাইপের উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা বহন করে। লক্ষণীয়, যে সকল টাইপ চরিত্র সর্বদাই ঘটনা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারিত্রিক পরিচয় অপরিবর্তিত রাখে সেই সকল টাইপ চরিত্র স্থির। চরিত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক গুণাবলী ধরে থাকে। অন্যপক্ষে Round Character অবস্থা বা ঘটনা বা পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রের বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেই সকল Round Character হল গতিশীল। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের লক্ষণ মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গ ল কাব্যের চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হবে।

পাশাপাশি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। প্রসঙ্গত, অ্যারিস্টটলের কথায় আসা যাক্। তিনি তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে চরিত্র বিচারের কয়েকটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন। সেগুলি তাঁর কথায় —

(ক) "First, and most important it must be good. Now any speech or action that manifests moral purpose of any kind will be expressive character : the character will be good if the purpose is good."[৩]

(খ) "The Second thing to aim at is propriety."[৪]

(গ) "Thirdly, character must be true to life : for this is a distinct thing from goodness and propriety, as here described."[৫] এবং

(ঘ) "The fourth point is consistency :"[৬]

তাঁর এই চরিত্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের পরিচয়, চরিত্রের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিতে হবে। কাহিনীর পরিবর্তনের সঙ্গে তার আচরণ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, অথবা চরিত্রটিকে ঘটনা কীভাবে প্রভাবিত করছে সেই দিকটিও চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে। আবার পরিবেশ, পরিস্থিতি, অবস্থান এবং অন্য চরিত্রের সহাবস্থানকে সামনে রেখে চরিত্রটির হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবলোকন করতে হবে। তবে মধ্যযুগের তথা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে আর একটি দিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে সকল চরিত্র পুরাণ - প্রভাবিত, সেই সকল চরিত্র পুরাণকে কতটা মেনে সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষ্য করা হবে। চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটবে; বাইরে থেকে অলৌকিক ঘটনা বা দৈবী ঘটনার উপস্থাপনা ঘটলে চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে না। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রণে শিল্পের এই দিকগুলি থেকে উদাসীন থাকলে চলবে না।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'দেবখণ্ড' (আলাদা নয়), 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'-এর চরিত্রগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, পুরাণ নির্ভর দেব-দেবী চরিত্র; দ্বিতীয়ত, লোকজীবন নির্ভর মানব চরিত্র। এদের মধ্যে আবার রয়েছে প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ এবং নারী চরিত্র। দেব-দেবী চরিত্রের মধ্যে প্রধান পুরুষ চরিত্র **শিব** হলেও প্রথমে প্রধান নারী চরিত্র **চণ্ডী**-র স্বরূপই বিশ্লেষণে আসব। কারণ এই গ্রন্থের নাম ও সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হল সে। তারপর শিব চরিত্রের আলোচনায় আসব। এরপর একে একে অপ্রধান পুরুষ চরিত্র **ধর্ম, নারদ, উলুক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিমালয়, শান্তনু, ভীম, গণেশ, কার্তিক, শনি, হনুমান, বিশ্বকর্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, চিত্রগোবিন্দ, ডাক, ডেউর, মালাধর, জয়ধর, পুষ্প দত্ত, বিদ্যামন্ত** ও অন্যান্য এবং নারী চরিত্র **পদ্মা, মেনকা, গঙ্গা, কালী, ইমলা, বিমলা, জয়া, বিজয়া, শচী, রত্নমালা, উলুবা** ও **দুলুবা** ইত্যাদি চরিত্রের আলোচনায় আসব। প্রসঙ্গত, এই সকল প্রধান ও অপ্রধান দেব-দেবীর চরিত্রের আলোচনা তিনটি খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। কারণ, অধিকাংশ দেব-দেবী চরিত্র পুরাণ আশ্রিত ও তাদের অবস্থান এই কাব্যে স্বর্গে। সেই দিক থেকে কাব্যে তাদের প্রকাশ আখেটিক ও ধনপতি খণ্ডে হলেও অবস্থান ও স্বরূপের দিক থেকে তারা দেব-দেবী চরিত্রের আলোচনায় প্রথম স্থান পাবে। এরপর আলাদা আলাদা ভাবে আখেটিক ও ধনপতি খণ্ডের প্রধান ও প্রধান চরিত্রের আলোচনায় আসা হবে। আখেটিক খণ্ডের প্রধান পুরুষ মানব চরিত্র **কালকেতু** এবং নারী চরিত্র **ফুল্লরা**। আর অপ্রধান পুরুষ চরিত্র হল **ভাঁড়ু দত্ত, পুরাই দত্ত , সুরথ, ধর্মকেতু, নিশানকেতু, বেনিয়া** ও অন্যান্য এবং নারী চরিত্র হল **নিদয়া, কমলা, দয়াবতী, ফুল্লরার মাসিমা** ও অন্যান্য। অন্যদিকে, ধনপতি খণ্ডের প্রধান পুরুষ মানব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে **ধনপতি** ও **শ্রীমন্ত** এবং নারী

চরিত্রের মধ্যে **লহনা** ও **খুল্লনা**। অপ্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি হলো **জয়পতি, নিধুপতি, জনার্দন ওঝা, হরিয়া ছুতার, কাণ্ডার বুলন, লক্ষপতি, বিক্রমকেশর, শ্রীবৎস, উতু, পাতু, হরিবাণ্যা, ধনেশ্বর, গোপাল, ভোলা, শ্রীহরি, শালবাণ** ও অন্যান্য এবং নারী চরিত্রগুলি হল **দুর্বলা, সুশীলা, নিলাবতী, উর্বশী, রম্ভাবতী, নিলারানী** ও অন্যান্য। এবার চরিত্রগুলি বিশ্লেষণে আসা যাক্।

মঙ্গলকাব্যে তথা মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী **চণ্ডী**। অন্যান্য দেব-দেবীদের চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। একাব্যে দেবী অন্যায় ও ভয়ঙ্কর কাজ করলেও তার মধ্যে ইতরতা নেই। মনসার মত সে হীন ও নিষ্ঠুর নয়। কালকেতুকে স্বীয় ইচ্ছায় ধন দান, খুল্লনাকে বর দান, শ্রীমন্তকে রক্ষার সময় তার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সে নেপথ্যচারিণী শক্তিরূপে বিরাজ করেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বত্র যে চণ্ডীদেবীকে দেখা যায়, তা একই দেবী মনে করলে ভুল হবে। এই কাব্যে সেই দেবী আদ্যা, চণ্ডী, গৌরী ও দুর্গা নামে পরিচিত। দেবখণ্ডে সে পৌরাণিক দেবী। আর ব্যাধ ও ধনপতি খণ্ডে তার পৌরাণিক রূপের সঙ্গে লৌকিক স্বরূপটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করব।

তার পূর্বে, আমরা 'চণ্ডী' নামের উৎস সন্ধানে মনোনিবেশ ঘটাব। 'চণ্ডী' বা 'চণ্ডিকা' নামের অর্থ হল প্রচণ্ড শক্তিশালী, শত্রুনিধনে পারদর্শী প্রচণ্ড শক্তিধারিণী, শক্তিমত্তা ও প্রচণ্ডতা সম্পন্ন ইত্যাদি। কল্কি পূজার প্রবর্তক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (১৯০৯—১৯৭৮) বলেছেন — ''চণ্ডী = চণ্ড + (স্ত্রী লিঙ্গে) ঈপ্ = পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। .... ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। সৃজনোন্মুখ ব্রহ্মের ঈশাণাদি সমস্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। .... জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া — এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া দেবীই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা।''[৭] তবে এই চণ্ডীর সঙ্গে অনার্য চাণ্ডীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — '' চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোনও অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট নাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়।''[৮] ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে স্বরূপত দুর্গা, তন্ত্রের চণ্ডিকা এবং ওরাওঁ সম্প্রদায়ের চাণ্ডী বর্তমানে 'চণ্ডী' নামে পরিণত হয়েছে। কবিরা এই মিশ্র ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চণ্ডীকে এড়াতে পারেন নি। তাই 'চণ্ডী' নামটির কোন এক সূত্র থেকে নয়, বহুধারার একীভূতিকরণে 'চণ্ডী' নামটি হয়েছে।

প্রকৃত চণ্ডীর স্বরূপ নির্ণয় বা সন্ধান সত্যিই ধান ভানতে শিবের গীত করা। প্রথমেই শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন — ''ধর্মমতের ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চলিতে থাকে সমন্বয় ও স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একটি ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা যখন বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসি, তখন কোন্‌টি যে মূলধারা, আর কোন্‌গুলি যে উপধারা তাহা স্পষ্ট চেনা শক্ত হইয়া ওঠে।''[৯] এই কথা মনে রেখে আমরা দেবী চণ্ডীর স্বরূপ ও উৎস সন্ধানে যাত্রা করব। প্রসঙ্গত আমরা তিনটি ধারায় তার সূত্র নির্দেশ করব। (১) বৈদিক সাহিত্যে (২) মহাকাব্যে এবং (৩) পুরাণ পরিমণ্ডলে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্ট পূর্ব ৯০০ অব্দে লেখা 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'-র দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে —

''অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ বা প্রেব নশ্যসি। ...
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নমকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মারতমরণ্যানিমলংসিষম্।।''[১০]

অর্থাৎ ''হে অরণ্যানি! (বৃহৎ বন)। ... মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার সেখানে বিদ্যমান আছে, সেখানে কৃষক লোক অদৌ নেই। অরণ্যানী হরিণদের জননী স্বরূপা। এরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম।''[১০] অরণ্যাধি দেবতা অরণ্য পালনকারীর প্রতি দয়াবান। এই গ্রন্থের 'দেবী সূক্ত'-এ বলা হয়েছে —

''অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।। ১।।''[১১]

অর্থাৎ ''(বাগ্বেদীর উক্তি) আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দু অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।''[১১] এখানে বর্ণিতা আরাধিতা দেবী হলো 'বাক্'। সুকুমার সেন বলেছেন — ''ঋগ্‌বেদে রুদ্রের ক্রোধকে কিয়ৎ পরিমাণে মূর্ত করিয়া তাহাকে 'মনা' বলা হইয়াছে। ইহাই চণ্ডিকা বা চণ্ডী কল্পনার বীজ বলিয়া মনে হয়।''[১২]

অতঃপর খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম অথবা ৪র্থ থেকে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকে মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' (ষষ্ঠ অধ্যায়)-এ যুধিষ্ঠির একটি 'দুর্গাস্তব' বলেছে। 'ভীষ্ম পর্বে' (২৩ তম অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিজয় লাভের জন্য অর্জুনকে দেবী দুর্গার নিকট বর প্রার্থনা এবং তার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাতে বলে। অর্জুনের 'দুর্গাস্তব' —

''নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনী!।
কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে!।। ৪।।

ভদ্রকালি! নমস্তুভ্যং মহাকালি! নমোহস্তু তে।
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তুভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি!।। ৫।।''[১৩]

অর্থাৎ, ''সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনী! কুমারী! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে। আপনাকে নমস্কার করি।। ৪।। ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার্।। ৫।।''[১৩] এখানে দেবীর কালী, কাপালী, মহাকালী, উমা ইত্যাদির বিভিন্ন মাতৃকা নামের সঙ্গে চণ্ডী নামও ছিল। তার সঙ্গে মন্দরবাসিনী তথা দুর্গা নামের আভাস রয়েছে।

এই দুর্গা 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ' (সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ—৫ম শতক) গ্রন্থের ৮১ তম থেকে ৯৩ তম অধ্যায় পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায়ে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে সুপরিচিতা। এই গ্রন্থে দেবী ধূম্রাসুরকে বলে যে শুম্ভ পাঠিয়েছে তাকে হত্যা করতে। তখন ধূম্রাসুর —

'ইত্যুক্তঃ সোহভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ
হূঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।।'' ৯[১৪]

অর্থাৎ, ''দেবী এই কথা বলিবা মাত্র সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারা সেই অসুরকে ভস্মীভূত করিল।''[১৪] আবার —

''অথ মুণ্ডোহপ্যধাবৎ তাং দৃষ্টবা চণ্ডং নিপাতিতম্
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা।।'' ২০[১৫]

অর্থাৎ, ''চণ্ডীকে নিপাতিত দেখিয়া মুণ্ড, দেবীর প্রতি ধাবিত হইল তখন দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাত দ্বারা ধরাশায়ী করিলেন।''[১৫]

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ সম্পর্কে বলা হয়েছে —

''ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজখান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ।। ২৬
* * *
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভসমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা।।'' ৩২[১৬]

অর্থাৎ, ''অনন্তর সেই চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শূল দ্বারা শুম্ভাসুরকে আঘাত করিলেন শূলাহত শুম্ভাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। ... অনন্তর শূল গ্রহণ করবার সম্মুখে আগতিত নিশুম্ভাসুরকে দেবী অতিবেগে প্রক্ষিপ্ত নিজ শূল দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন।''[১৬] এখানে দেবী চণ্ডীর প্রচণ্ডা রূপটি পাওয়া যায়। তার প্রকৃত নাম এখানে চণ্ডিকা।

সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক থেকে ৮ম শতকের মধ্যে রচিত 'অগ্নিপুরাণ'-এ দেবীর স্বরূপ

সম্পর্কে বলা হয়েছে —

''চণ্ডী বিংশতিবাহুঃ স্যাদ্বিভ্রতী দক্ষিণৈঃ করৈঃ।
শূলাসিশক্তিচক্রাণি পাশং খেটায়ুধাভয়ম্।। ১
ডমরুং শক্তিকাং বামৈর্নাগপাশঞ্চ খেটকম্।
কুঠারাঙ্কুশচাপাংশ্চ ঘন্টাধ্বজগদাংস্তথা।। ২
আদর্শমুদগরান্ হস্তৈশ্চণ্ডী বা দশবাহুকা।
তদধো মহিষশ্ছিন্নমূর্দ্ধা পাতিতমস্তকঃ।। ৩
* * *
অদৌ মধ্যে তথেন্দ্রাদৌ নবতত্ত্বাত্মভিঃ ক্রমাৎ।
অষ্টাদহভূজৈকা তু দক্ষে মুণ্ডঞ্চ খেটমক।। ৭
* * *
ডমরুং তর্জ্জনীং ত্যক্ত্বা রুদ্রচণ্ডাদয়ো নব।
রুদ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।। ১০
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
উগ্রচণ্ডা চ মধ্যস্থা রোচনাভারুণাসিতা।। ১১
নীলা শুক্লা ধূম্রিকা পীতা শ্বেতা চ সিংহগাঃ।
মহিষোত্থঃ পুমান্ শস্ত্রী তৎকচগ্রহমুষ্টিকাঃ।। ১২
* * *
আলীঢ়া নব দুর্গাঃ স্যুঃ স্থাপ্যাঃ পুত্রাদিবৃদ্ধয়ে।''[১৭]

অর্থাৎ, ''চণ্ডীর বিংশতি বাহু। তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তসমূহে শূল, অসি, শক্তি, চক্র, প্রাস, খেট (চর্ম), অস্ত্রবিশেষ, অভয়, ডমরু, শক্তি এবং বাম করসমুহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু, ঘন্টা, ধ্বজা, গদা আদর্শ (আরসি) ও মুদগর (মগুর)। অথবা চণ্ডীর দশবাহু তাহার অধোভাগে ছিন্নমুণ্ড ও মহিষের ছিন্ন মস্তক পতিত থাকিবে। ... প্রথমে বিংশতি হস্ত মধ্যে দশ হস্ত ও তারপরে নরভূজা, অষ্টাদশভূজা, মূর্তির পূজা কর্তব্য। চণ্ডীর আর এক মূর্তির অষ্টাদশ বাহু। রুদ্রচণ্ডাদিময় মূর্তির হস্তে ডমরু ও তর্জনী ভিন্ন উল্লিখিত সমস্ত অস্ত্রই বিরাজমান থাকবে রুদ্রচণ্ডা শব্দে। রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডোনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডীকা ও উগ্র চণ্ডা; এদের বর্ণ যথাক্রমে (রাচনাহ, অরুণ, অসিত, নীল, শুক্ল, ধূম্র, পিত ও শ্বেত) এরা সকলেই সিংহের উপর আরোহন করে আলীঢ় আসনে অস্ত্র যুক্ত হয়ে, মুষ্ঠি দ্বারা মহিষ ও তার গ্রীবা সম্ভূত পুরুষের কেশ ধারণ করে। একে নব দূর্গা বলে।''[১৭]

'দেবী-ভাগবত' (খ্রীষ্টীয় ১১ শতক — ১২ শতক)-এ ব্যাসদেব দেবী সম্পর্কে বলেছেন — ''ভগবান বিষ্ণু এইরূপ কহিবামাত্র ব্রহ্মার বদন মণ্ডল হইতে স্বতই অতীব অসহনীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্ভুত হইল। উহার বর্ণ পদ্মরাগবৎ লোহিত উহা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ এবং মরীচিমালায় মণ্ডিত থাকায় দেখিতে অতি সুন্দর! হে মহারাজ! অমিত বিক্রমশালী মহাত্মা হরি ও হর ব্রহ্মমুখনিঃসৃত সেই তেজমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অতঃপর শঙ্করের শরীর হইতে রৌপ্যবর্ণ, দুনিরাক্ষ্য অতি তীব্র, দৈত্যগণের জয়প্রদ অসুরগণের বিস্ময়কর, পর্ব্বতোপম অপর তমোগুণ সদৃশ ভয়ঙ্কর পরমাদ্ভুত দারুণ তেজঃ নির্গত হইল। অনন্তর ভগবান বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলকান্তি সত্ত্বগুণময় মহাপ্রভাশালী অপর তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎপরে দেবরাজের শরীর হইতে যে তেজঃ নির্গত হইলো, উহা দেখিতে পরম মনোহর, সর্ব্বগুণময়, বিচিত্র বর্ণ ও দুঃসহনীয় অনন্তর ক্রমে কুবের, যম, অগ্নি, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে দেদীপ্যমান মহৎ তেজঃ নির্গত হইল ... দেখিতে দেখিতে দেবগণের সমক্ষেই সেই তেজঃপুঞ্জ, বিস্ময়কর অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী রমণী রূপে পরিণত হইল। ... সেই দেবী অদ্যাশক্তি, সহস্র সহস্র বাহুশালীনি হইতেই তৎকালে অসুরের সংহারার্থ সুরগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে অষ্টাদশ ভূজা হইয়া সমুদ্ভুতা হইলেন।''[১৮]

সুতরাং চণ্ডী শক্তিদেবীর অনেক রূপ ও বহুমূলের একীভূতরূপ। ঋগ্বেদে তাকে শক্তিরূপিনী, সৃষ্টিরূপিনী, অরণ্যানী রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। সেখানে তার দ্বিভুজা মূর্তি। মহাভারতে অর্জুন সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য দেবীর স্তব করে। সেই দিক থেকে মহাভারতে সে অভয়দায়িনী। তাকে মন্দরবাসিনী বা পর্বতবাসিনী, কালী, কপালি, কপিলে, মহাকালী, চণ্ডী, অভয়তারিনী বলা হয়েছে। এই চণ্ডী নামটি প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতে। তার অবস্থান দুর্গমগীরিতে তথা পর্বতে। তাই সে দুর্গা। তবে দুর্গা নামটির উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় না। তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। সুকুমার সেন বলেছেন — ''দুর্গা (ইহার রূপান্তর দুর্গি) নাম প্রথম পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। দুর্গা (দুর্গি) নামের আসল অর্থ ছিল দুর্গম স্থানে অধিষ্ঠাত্রী। পরে এর অর্থ হয়েছে দুর্গে অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্রী।''[১৯] মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দুর্গার অরণ্যানী চণ্ডীর মাহাত্ম্য দৃষ্টিত হয়েছে। যেখানে তার নাম অভয়া চণ্ডী। চণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী (অরণ্য নিবাসিনী) এবং এর বাহন (ও প্রতীক) গোধা। সুকুমার সেন বলেছেন — ''সেখানে ইঁহার বিশিষ্ট নাম অভয়া (অর্থাৎ অভয়াদায়িনী) চণ্ডী। ইনি বিন্ধ্যবাসিনী (অর্থাৎ অরণ্যনিবাসিনী) এবং ইঁহার বাহন (ও প্রতীক) গোধা।''[২০] ঋগ্বেদে সৃষ্টিরূপিনী, অরণ্যানী ও অভয়াদায়িনী মহাভারতে চণ্ডী নামে চিহ্নিত হয়েছে। উভয়ই অভয়াদায়িনী ও চণ্ডী স্বরূপত একই। তবে মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডীর প্রচণ্ডা রূপটি পাওয়া যায়। সেখানে তার নাম চণ্ডিকা। সুকুমার সেন বলেছেন — ''চণ্ডিকা বা চণ্ডীর অর্থ প্রচণ্ডা দেবী।''[২১] সে শুম্ভ-নিশুম্ভ দলনী মহিষাসুরমর্দিনী ও দশভূজা। এই দেবী চণ্ডীর সঙ্গে ঋগ্বেদের ও মহাভারতের অভয়াদায়িনীর স্বরূপ

পৃথক। অগ্নিপুরাণে চণ্ডী মহিষমর্দিনী দুর্গায় পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন বলেছেন — ''দুর্গা আসলে দুর্গম পন্থায় অভয়দায়িনী দেবী, ঋগ্‌বেদের অরণ্যানী। তার সঙ্গে মিশে গেছে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনী। চণ্ডী দুর্গার নামান্তর।''[২২] সম্ভবত দশম-একাদশ শতাব্দীতে এই দশভুজা চণ্ডীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবী ভাগবত-এর শিব প্রমুখ দেবতার দেহ থেকে নিষ্কাশিত তেজপিণ্ড রূপ। এই গ্রন্থে দেবী অষ্টভুজা। তার বাহন সিংহ। শিবের দেহের তেজ থেকে জন্ম বলে চণ্ডীকে শিব গৃহিণী রূপে রূপান্তরিত করা হয়। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন বলেছেন — 'পুরাণে দুর্গা-চণ্ডী সরাসরি দেহ হইতে নিষ্কাশিত তেজের পিণ্ডীভূত রূপ।''[২৩] এভাবে পৌরাণিক প্রচণ্ডা চণ্ডীর সঙ্গে রক্ত-মাংসে গড়া লৌকিক চণ্ডীর সংমিশ্রণ ঘটে। তাই মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপে কোথাও শিব গৃহিণীর গার্হস্থ্য জীবন, কোথাও সৃষ্টিরূপিণী, কোথাও অরণ্যানী, কোথাও নারী সমাজে গৃহকল্যাণের জন্য মঙ্গলচণ্ডী, কোথাও অভয়দায়িনী রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। আবার মুসলমান অধিকারের পরই শক্তিসাধক বাঙালী অন্যতম গ্রন্থ 'কালিকাপুরাণ' রচনা করে ঘনায়মান অন্ধকারে একমাত্র আশা ও ভরসার শক্তিময়ী দেবীরূপে কালী বাঙালীর চিত্ত অধিকার করে ফেলেছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পর থেকে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য বা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্মশান কালীই চণ্ডীতে পরিণত হল। বাঙালী ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — ''ত্রয়োদশ -চতুর্দশ শতকে বাঙালীর অন্যতম শ্মশানে কালীর উপাসনা করিয়াই ভয়-ভাবনার কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহা চণ্ডী, বেং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রতাপ দুর্জয়!''[২৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি এই দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে নামকরণ এবং তাকে মধ্যমণি করেই কাব্যের কাহিনীর ক্রমবিকাশ।পুরাণ, লৌকিক ও তন্ত্রভাবনা দ্বারা চণ্ডী চরিত্রটি বিন্যস্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'চণ্ডী' দেবী চরিত্র। সাধারণ মর্ত্যের মানুষের মত নারী-পুরুষের মিলন জনিত বীর্যে বা মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয় নি। তার জন্ম হয় আদি-ধর্ম বা আদি-বুদ্ধের 'হাম্বি' বা হাই থেকে। তাই তার নাম আদ্যা। এখানে তার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে। সে পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়। ধর্ম আদ্যার যৌবন সম্ভোগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদ্যা বলে — ''জন্ম দিঞা বল কৈলে ধর্ম্ম নাশ হয়।।''[২৫] আদ্যার কথায় ধর্ম তার নিজ প্রবৃত্তি সংবরণ করে। আদ্যাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ করার জন্য সপ্তবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সর্বশেষে হিমালয় গৃহে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর গৌরী পিতার আজ্ঞায় শিব পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। শৈশবকাল থেকে গৌরী পিতার অনুশাসনে বড় হয়েছে। শিবের জন্য সে গ্রীষ্মের দাবদাহে অগ্নি জ্বালিয়ে ধ্যান মগ্ন থেকেছে। কেনোনা, মানিক দত্তের কাব্যে আদ্যাকে সাতবার মরতে এবং কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল এই শিবকে পাওয়ার

জন্য। কারণ শিব বৃদ্ধ ও দরিদ্র হলেও সমাজে তার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা রয়েছে। গৌরী সে সম্পর্কে সচেতন। তাই শিবের কথায় গৌরী বলেছে —

"দুর্গা বোলে শিব ঠাকুর কেন ভাণ্ড মোকে।
কে বলে দারিদ্র তুমাক পুজে দেবলোকে।।"[২৬]

বলাবাহুল্য, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আদ্যাই গৌরী, গৌরীই দুর্গা বা চণ্ডী নামে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কাব্যে চণ্ডী নামের তুলনায় দুর্গা নামের ব্যবহার বেশি। দুর্গার বিবাহ হয় অতি শৈশব বেলায়। তার বিবাহে সমাজের বাল্যবিবাহের দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিবের অতিবৃদ্ধ ও বাদিয়া রূপ দেখে মেনকা কন্যাকে কোলে করে কাঁদে এবং বিবাহ সভায় হিমালয় কন্যাকে কোলে নিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। যেমন — (১) "কান্দেন মেনকা রাণী গৌরী করি কোলে।"[২৭] (২) "পিতার কোলে চড়ি দুর্গা শিব স্থানে আল্য।"[২৮] গৌরীর বিবাহের পর মাতৃরূপ প্রকাশ পায়। সে তার গায়ে মলি বা গাত্রমল দিয়ে মানবরূপী পুতুল তৈরী করে। সেই মলির পুতুল থেকে গণেশের জন্ম হয়। তবে শিবের রেত কর্তৃক চণ্ডীর মাতৃগর্ভ থেকে কার্তিকের জন্ম হয়। এই পর্যন্ত তার লৌকিক স্বরূপটি স্পষ্ট।

এরপর তার পৌরাণিক প্রচণ্ডা রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে সকল দেবতার অস্ত্র সহযোগে দুর্গা অসুরদের নিধন করতে রণক্ষেত্রে যাত্রা করে। রণক্ষেত্রে দুর্গার ভয়ঙ্করী রূপ লক্ষ্য করা যায়। তার রক্তবীজ, মহাবীজ, মহিষাসুর, মহীধর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বিনাশের মধ্যে পুরাণ স্বরূপটি স্পষ্ট।

"ক্রোধিত হঞা দুর্গা মাতা মুখ মেলিল।
সারথি সহিতে তাকে গিলিঞা ফেলিল।।"[২৯]

দেবী দুর্গা ভয়ঙ্করী রূপ থেকে চামুণ্ডা রূপ ধারণ করেছে। সে অসুরদের কেটে তার রক্ত পান করেছে এবং তার মুণ্ড মালা গলায় ধারণ করেছে। রণক্ষেত্রে দুর্গার ঘাম থেকে চামুণ্ডা কালীর জন্ম হয়। কবি দুর্গাকে কালীতে রূপান্তরিত করেছেন। কালীর অসুর দলনী প্রচণ্ডা মূর্তি লক্ষ্য করে দেবতাগণ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য কালীর পদতলে স্বামী শিব অবস্থান করে। তাতে তার লজ্জাবোধ হয়।

"পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।"[৩০]

এই ভাবে কালীর ক্রোধকে নিবারণ করা হয়।

অতঃপর দেবীর লৌকিক স্বরূপটি উঠে এসেছে। দেবী পুত্র পালনের জন্য ইন্দ্রপুর থেকে পঞ্চদাসী নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসে। শিবের পঞ্চ দাসীকে দেখে মন উচাটন হয়। দেবী তারই

সাক্ষাতে স্বামী শিবের এমন হৃদয় বিদারক আচরণে ব্যথিত হয়। এই অবস্থায় পঞ্চদাসীকে তার পিছনে আড়াল করা ছাড়া উপায় নেই। নারী হয়েও সে প্রতিবাদ করতে পারছে না। পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি তার প্রতিকূল। সেই অবস্থা তার মনে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তার হৃদয়ে এক, বাইরে আর এক।

''জোড় করে বলে দুর্গা মধুর বচন।
পুত্র পালন হেতু দাশী পঞ্চজন।।''[৩১]

কবি মানিক দত্ত দেবীকে পুরাণ কথিত দেবত্ব হারিয়ে একেবারে রক্ত মাংসের নারীতে পরিণত করেছেন। কিন্তু দুর্গাকে শেষ পর্যন্ত নারীত্বের লড়াইয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিস্থিতির কাছে হার মানতে হয়েছে। শিব বলেছে — ''জে জন পালন করে সে জন জননী।।''[৩২] সমাজ কথিত এই বাণী দ্বারা শিব স্ত্রী দুর্গাকে স্তব্ধ করে দেয়। আর চণ্ডী অসহায় ভাবে স্বামীর অশ্লীল আচরণকে মানতে বাধ্য হয়েছে। তাই সে বলে —

''দুর্গা বলে ক্ষেমা কর দেব শূলপাণি।
তোমার সাক্ষাতে দাসী আনি তবে আমি।।''[৩৩]

পুত্রদের দাসীর কাছে রেখে দেবী মর্ত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কলিঙ্গ রাজ্যে দোহরা স্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — ''ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!''[৩৪] কলিঙ্গে প্রজা সকল তাকে ছাগল মহিষ বলি দিয়ে দশভুজার পূজা করে। এখানে কবি দুর্গা ভাবনার সঙ্গে কালী সাধনা যুক্ত করে চণ্ডীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। এই মিশ্র দেবী-ভাবনার সঙ্গে সহজ-সরল লৌকিক ভাবনাও চণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কলিঙ্গে তার পূজা প্রচার হলেও পৃথিবীর সর্বত্র তার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পদ্মার কাছে পরামর্শ নিয়েছে। তার মত এরূপ শক্তিশালী জগৎ-মাতার কাছে এইরূপ বুদ্ধির দ্বারস্থ হওয়া চরিত্রানুগ অসঙ্গতি ঠেকে।

''দুর্গা বোলে পদ্মা বাছা শুনহ বচন।
সুযুক্তি দেহ বাছা করিব কেমন।।''[৩৫]

পদ্মার পরামর্শে চণ্ডী প্রফুল্লনগরের কানা খোঁড়া মানিক দত্তকে দিয়ে কলিঙ্গে তার মাহাত্ম্য প্রচারের নির্দেশ দেয়। দেবীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য কথা শুনে প্রজাসকল মোহিত। কলিঙ্গ রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে কবি মানিক দত্তকে কারারুদ্ধ করল। ভক্ত বৎসল দেবী মানিক দত্তকে উদ্ধারের জন্য কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখায় এবং রাজা তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়। দেবী ভক্তের প্রতি এখানে অভয়দাত্রী।

মানিক দত্তের কাব্যে দেবী চণ্ডীর গৃহিণী রূপ বা দাম্পত্য জীবন যৎসামান্য। তাও কলহ

মুখর। তার সূত্রপাত দেবীর পূজা প্রচারের জন্য পশুসৃজনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাদের বসবাস ও আহারের ব্যবস্থা করেনি। কারণ দুরবস্থায় পড়ে পশুরা তার শরণাপন্ন হবে। তবে শিব তার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়। তারপর দেবী শিব-তপস্যায় রত ইন্দ্রকে ছলনা করতে বৃদ্ধা যোগিনীর বেশ ধারণ করে। তার তপস্যা ভঙ্গ করে তাকে বলে —

''শিবের সেবা ছাড় দুর্গার সেবা কর
পুত্র দিবেন নারায়ণী।।''[৩৬]

তার কথার মধ্যে দেবী চণ্ডীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সুর রয়েছে। সেই সঙ্গে শিব ও শক্তির দ্বন্দ্ব তথা শিবের সঙ্গে চণ্ডীর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। লক্ষণীয়, চণ্ডী তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইন্দ্রকে পুত্র বর দিতে চেয়েছে। সেই স্থানে ইন্দ্রের পিতৃ হৃদয় শূন্য। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন মহাশয় সঙ্গত কারণেই বলেছেন — ''কাহিনীর তলায় তলায় শিব-দুর্গার দাম্পত্য ঘটিত নয়, নিজ নিজ পূজাঘটিত — দ্বন্দ্বের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ আছে। নীলাম্বরের সম্পর্কে তাহা দেখিয়াছি।''[৩৭] নীলাম্বরকে সে ইন্দ্রের পুত্র হিসাবে বর প্রদান করে।

অতঃপর তার দাম্পত্য জীবনের চিত্রটি উঠে আসে। একই সঙ্গে দেবী চণ্ডী স্বামীর প্রতি রুষ্ট হয়ে বাঙালী গৃহবধূর মত বাপের বাড়ি যেতে পিছপা হয়নি।

''কন্দল করিঞা দুর্গা বলে নাইহরতে।
পশ্চাতে চলিল শিব দুর্গাকে ফিরাত্যে।।''[৩৮]

এই লৌকিক গৃহবধূর রূপের পাশাপাশি দেবীর পৌরাণিক রূদ্র রূপটিও একাকার হয়ে গেছে। এই দ্বন্দ্ব আরো দৃঢ় রূপ পায় নীলাম্বরের অধিকারকে নিয়ে। দেবী চণ্ডী —

''শিবকে দেখিঞা দুর্গা চক্র নৈল হাতে।
চক্র নঞা ডাণ্ডাইল শিবের সাক্ষাতে।।
অতি ক্রোধ হঞা দুর্গা চক্র ছাড়ি দিল।
চক্রের আনলে শিব ঘামিতে লাগিল।।''[৩৯]

শিবের দেহ নিষিক্ত ঘর্ম থেকে ধর্মকেতু ও নিশানকেতু নামে দুই ব্যাধের জন্ম হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে চণ্ডী তার বস্ত্র নিষিক্ত জল থেকে নিদয়া ও কমলা নামে দুই ব্যাধিনীর সৃষ্টি করে। চণ্ডীর নিষ্ঠুর ও উগ্র রূপটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য মনে আসে। সেটি হল — ''... শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোন সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।''[৪০] চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে শিব নীলাম্বরকে অধিকার করলে তাতে তার প্রবল প্রতিবাদ, এমনকি স্বামীর প্রাণনাশ করতে সে

পিছপা হয়নি।

চণ্ডী শুধু নিষ্ঠুর নয়, সে ছলনাময়ীও বটে। সে নীলাম্বরকে ধর্মকেতু ও নিশানকেতু কর্তৃক ছলনা করে। এই দুই ব্যাধের মর্ত্যভূমিতে মুক্ত স্বাধীন জীবন দেখে পরাধীন নিয়ম শৃঙ্খলের গণ্ডীতে বাঁধা নীলাম্বর মর্ত্যভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ছলনা করে ফুলের ভিতরে কীটরূপে লুকিয়ে থাকে দেবী চণ্ডী, যাতে শিব পূজার সময় নীলাম্বরের অসচেতনতা ও অন্যমনস্কতার জন্য তাকে অভিশপ্ত করে। নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধ কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করে। তার অত্যাচারে পশুকুল অস্তিত্ব-সংকটাপন্ন বোধ করে এবং আত্মরক্ষার জন্য বনদেবী অভয়ার কাছে আসে। অভয়া তাদের,

''সভাকারে বর দিল সর্ব্বমঙ্গল।
পশু বর দিল মাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।।''[৪১]

এখানে দেবী চণ্ডী স্বরূপত অরণ্যানী। দেবী চণ্ডী পশুদের বর দেওয়ার পাশাপাশি কালকেতুর শিকার থেকে বিরত রাখতে গোধিকা রূপ ধারণ করে। কালকেতুর কাছে সে বন্দী হয়। তার বন্ধনে দেবী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে।

''গোধিকা বান্ধিল বীর ধনুকের হুলে।
পৃষ্ঠের বন্ধনে বুক চড় ২ করে।।
আঝর নঞানে কান্দে ভকত বৎসল।
সকরুনে কান্দে দেবী চক্ষের মোছে জল।।''[৪২]

তার এরূপ আচরণ দেবী-স্বভাবসুলভ নয়। দেবী হয়ে এইরূপ আচরণ হাস্যকর বলে মনে হয়। দেবীর মধ্যে সঙ্কটাপন্ন মানবের গুণ বর্তমান। সাধারণ মানুষের মত সে সন্তান বৎসল এবং সমাজ বা পরিবার বন্ধন ছিন্ন হবার আশঙ্কায় চিন্তিত। তাতে তার চরিত্রে মাতৃসত্তার দিকটি প্রবল। তাই সে বলে —

''পদ্মা আর কি কৈলাশে জাব কার্ত্তিক গনাই কোলে নব
কার্ত্তিক মাওড় হইল মোরে।।
পদ্মা নারদে দেখিতে পাইলে শিবের আগে কৈহা দিবে
শুনিলে প্রভু না লইবে ঘরে।''[৪৩]

নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ কর্তৃক দেবী বন্দী। পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনে নারীর কলঙ্ক রটনার আশঙ্কা প্রবল। তা নারী জীবনে কঠিন বিপত্তির সৃষ্টি করে। সেরূপ নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ গৃহে আবদ্ধ উচ্চবর্ণের কুলবধূ চণ্ডীর আশঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক।

ফুল্লরা সংসারে দেবী চণ্ডী অন্যের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উপস্থিত হয়। ফুল্লরার দুঃখের

সংসার। উপরন্তু সে সন্তানহীনা। এই মতাবস্থায় দেবী তার দুর্বল স্থানটি অধিকার করার অভিলাষী। সে বলে — ''কেবল পুত্রের কারণ এহি আমার আশ।।''[৪৪] একথা শুনে ফুল্লরার অন্তর দগ্ধ হয়ে যায়। আবার দেবী সুন্দরী রমণী। তাই সে ব্যাধ-কর্ম করেও সমস্ত সুখ ভোগে তার প্রাধান্য থাকবে, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়। ফুল্লরার মানসিক যন্ত্রণা এখানেই। তাই সে বারমাসের দুঃখ বেদনার কথা দেবীর সম্মুখে অকপটে ব্যক্ত করে। দেবীর কাছে ফুল্লরার চাতুরী সহজে ধরা পড়ে। একথা শুনে ফুল্লরা প্রচণ্ড রেগে যায়। সেই অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য দেবী অত্যন্ত চতুরতার পরিচয় দেয়। এখানে দেবী স্ব-ইচ্ছায় আসেনি। সে বলে —

''দিয়া আপনার ধন দুঃখ নেবারিব।।
কালু হবে মহারাজা তুমি হবে রানী।
* * * * *
আমি অপুত্রের পুত্র দেই নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধে চক্ষুদান দেই বন্দী বিমোচন।।''[৪৫]

দেবীর এখানে ধনদাত্রী ও বরদায়িনী রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, চণ্ডীর মানবী ও চামুণ্ডা রূপটিও স্পষ্ট। ফুল্লরা দেবীকে গৃহে রেখে কালকেতুর কাছে যায়। গৃহে ফিরে কালকেতু দেবীকে দেখে নতজানু হয়ে প্রণাম করে। তাতে চণ্ডীর পরিচয়ে দেবত্বের দিকটি স্পষ্ট হলেও সাধারণ মানুষের ন্যায় সে মৃত্যু ভয়ে ভীত। কালকেতু রাজদণ্ডের ভয়ে তাকে গৃহ ত্যাগ করতে বলে। দেবী তাতে অস্বীকার করলে কালকেতু তাকে ধনুকের ভয় দেখায়। তখন দেবী — ''ভয়ে ভবানীর গাও কাঁপে থর থর।।''[৪৬] পরক্ষণে, সে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। কালকেতুর বাণ ধনুকেই আটকে যায় এবং সে নিরস্ত্র হয়। অতঃপর দেবী কালকেতুকে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করে। কিন্তু কালকেতু দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। দেবী তখন তার শবের উপর অধিষ্ঠিতা ভয়ঙ্কর চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে।

''জিহ্বা হৈল লহ ২ মুখ ঘোরতর।
দেখিতে ২ ঐরি জায়ে যম ঘর।।
হইয়া লাঙ্গুট দারা কমরে ঘাগর।
বামে শোভিত খাণ্ডা দক্ষিণে খাপর।।
* * *
হস্তে মুণ্ড পাএ মুণ্ড কমরে হাতের মাল।
শ্যামার পদভরে নড়ে সপ্ত পাতাল।।''[৪৭]

দেবী চণ্ডীর সঙ্গে কালীর ভাবনা একত্রিত হয়ে গেছে। দেবীর এই স্বরূপ শব বা মৃতের উপর প্রাণ

প্রতিষ্ঠার প্রতীক। তার এই রূপ দেখে কালকেতু মূর্ছিত হয়ে যায়। চণ্ডী তাকে কোলে তুলে নেয়।

''প্রাণ পুত্র বলিয়া তুলিআ লৈল কোলে।
শ্যামার কোলে কালকেতু পড়িল নিদ্রাভোলে।।
আপনার পাদপদ্ম বীরের মাথে দিল।
মূর্ছাগত ছিল কেতু চৈতন্য পাইল।।''[৪৮]

মূর্ছাগত কালকেতুকে দেবী কোলে তুলে নেওয়ার মধ্যে তার মাতৃকারূপ পরিস্ফুট হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন — ''বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসগঠন সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি প্রবল হইয়া উঠিল।''[৪৯] পাশাপাশি দেবী কর্তৃক প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি রক্ষার আভাস পাই। মানিক দত্তের চণ্ডী কেবল ভক্তবৎসল নয়; সে মাতৃরূপিনী ও সৃষ্টি রক্ষাকর্ত্রীও বটে। ক্ষুদিরাম দাসও 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডী সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন সে কথাটি মানিক দত্তের চণ্ডী প্রসঙ্গেও খাটে। তিনি বলেছেন — ''কবির লেখনীগুণে দেবতাও ছলনাময়ী ও কদাচিৎ স্নেহবৎসলা মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে এইটিই লক্ষণীয় বিষয়।''[৫০] এই স্নেহবৎসলা দেবী আবার তার স্বরূপ সম্পর্কে কালকেতুকে বলেছে —

''আমি পুরূষ প্রকৃতি বটি কহিলাঙ তোমারে।
গোপ্ত কথা আর জানি পুছহ আমারে।।''[৫১]

তার রূপে পুরুষ মহাদেব শব রূপে সৃষ্টি সংহার কর্তা, আর প্রকৃতি তার উপর অধিষ্ঠিতা দেবী সৃষ্টিকারিণী। তার মূর্তিতে শবস্থানে প্রাণের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। তাই দেবীর কথায় মনে হয় তন্ত্রের কালী বা চামুণ্ডাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর স্বরূপের সঙ্গে মিশে গেছে।

স্নেহবৎসল দেবী ভক্তের জন্য সকল প্রকার বিপদে রক্ষার অভয় দান করে। দরিদ্র কালকেতুর এত ধন দেখলে লোকজন রাজা-স্থানে জানালে রাজা তাকে দুষ্কৃতি সন্দেহে দণ্ড দিবে। সেই ভয়ে বীর ভীত। তখন চণ্ডী তাকে বলে —

''আমি দুর্গা আছি তোর শিয়রের উপর
কি করিবে দণ্ডের ঈশ্বর।।''[৫২]

অতঃপর কালকেতু দেবীর অঙ্গুরী পুরাই দত্তের কাছে বিক্রি করে কোদাল খনতা কেনে। এই খনতা কোদাল কৃষি সভ্যতাকে নির্দেশ করেছে। তা দিয়ে কালকেতু দেবীর নির্দেশে মাটি থেকে সাত ঘড়া ধন প্রাপ্ত হয়। সেই সাত ঘড়া ধন দিয়ে দেবী কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর স্থাপন

করবে। দেবীর এই আচরণের মধ্য দিয়ে কৃষি সভ্যতার হাত ধরে নগরায়নের উত্তরণের দিকটি নির্দেশ করে। কৃষি কাজের দুরবস্থা কবির কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কলিঙ্গ নগর ভাঙ্গনের সময় বাঙলার কৃষি ভেসে যাচ্ছে গুজরাট নগর পত্তনের জন্য। কবির কথায় —

''ছাগল ভেড়া মনিষ্য ঘোড়া গোরু পালে পাল।
জোয়াল নাঙ্গল ভাসে কোদালি আর ফাল।।''[৫৩]

কৃষি কার্যে দুরবস্থায় এরূপ নগরায়ন ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। যা কবি দেবী চণ্ডীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী কেবল কালী, চামুণ্ডা, দুর্গা, অভয়া, বনদেবী নয়, সে লক্ষ্মী রূপও বটে। সে কালকেতুকে ধন দান করেছে। সেই ধন গৃহে স্থাপনের জন্য দেবী কালকেতুকে ধন পূজা করতে বলেছে। ধন পূজার সঙ্গে কালকেতু তাকেও পূজা দেয়। ধনদেবী লক্ষ্মী যেন এখানে চণ্ডীতে পরিণত হয়েছে।

''জঙ্গলের পুষ্প তুলি আনিল বিস্তর।
ধন পূজা করে বীর অক্ষটী কুণ্ডর।।
এক অঞ্জলি পুষ্প তুলিল হৃদয়ে।
আস্থা করি দিল পুষ্প চামুণ্ডার পায়ে।।''[৫৪]

এই ধনলক্ষ্মীরূপী চণ্ডীর সঙ্গে শিবের দ্বন্দ্ব মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে প্রকট হয়েছে। যার সূত্রপাত হয়েছিল বীজুবন সৃষ্টি ও নীলাম্বর অধিকার নিয়ে, তা প্রবল রূপে প্রকাশ পায় শিব ভক্ত ভাঁড়ুর সঙ্গে চণ্ডীর দ্বন্দ্বে। চণ্ডী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার জন্য উপস্থিত হয়েছে গঙ্গার পুত্র ডাক ও ডেউরের রাজদরবারে। তাদের অবস্থান সান্তাল পর্বতে। তাদেরকে নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ বলে মনে হয়। এই অন্ত্যজদের নিয়ে দেবী চণ্ডীর বিদ্রোহ। বিদ্রোহ তার উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে। ভাঁড়ু সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেবতা শিবের উপাসক। তাই দেবী চণ্ডী ভাঁড়ুকে তার ঐতিহ্যবাহী অটল ভক্তি ভাবনাকে পরিবর্তন করতে ডাক ও ডেউর কর্তৃক কলিঙ্গ নগরে বন্যার সূচনা করে। কিন্তু তাতেও ভাঁড়ু দত্ত দেবীকে মেনে নেয় না। বরং ভাঁড়ু দত্ত শিব-মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের আত্মবলকে দৃঢ় করেছে। সেই কারণে দেবী চণ্ডী তাকে বন্যায় ভাসিয়েছে। আত্মরক্ষার ঘর পর্যন্ত ইঁদুর দ্বারা ফুটো করে জলে পূর্ণ করেছে। ভাঁড়ু দত্তের সমস্ত স্বজনকে প্রাণ রক্ষার জন্য উঁচু স্থানে উঠতে হয়েছে। এমনকি সেখানেও ঘরে টঙ্ পর্যন্ত বন্যায় প্লাবিত করেছে চণ্ডী। শেষপর্যন্ত নারদের অনুরোধে সে ভাঁড়ু দত্তকে প্রাণে রক্ষা করে। ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর লড়াইয়ে আর্য-অনার্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটি সুস্পষ্ট বলে মনে হয়।

অতঃপর ভাঁড়ুদত্ত গুজরাট নগরে চণ্ডীর অনুগত ভক্ত কালকেতু কর্তৃক অপমানের প্রতিশোধ

নেবার জন্য কলিঙ্গরাজ সুরথকে উস্কে দেয়। শিব ভক্ত সুরথরাজ কালকেতুকে বন্দী করে। দেবী চণ্ডী তার কারারুদ্ধ ভক্তকে উদ্ধারের জন্য অলৌকিক 'হিড়িমকসের চাল' প্রদান করে। সেই চালে দেবীর চার অবতারের পরিচয় পাই। তাতে চণ্ডীর স্বরূপে লৌকিক ভাবনার মিশ্রণ ঘটেছে। আদিম অনার্য জাতির মধ্যে পশুশিকার ও পশুপালন এবং ভূতপ্রেত থেকে একটি মানসিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তারা এই সকল পশুপাখি শিকারের পিছনে অলৌকিক শক্তির কল্পনা করত। পশুপাখি ও ভূতপ্রেতের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক নিবিড়। তাই অনার্যরা পশু-পাখি ও ভূতপ্রেতকে দেবদেবীর অলৌকিক কল্পনায় মিলিয়ে ফেলেছে। সঙ্গত কারণেই পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন — ''এই পর্বে পশু ও মানুষের মিশ্রিত মূর্তিতে দেবতাদের কল্পনা করা হয়েছে, ...।''[৫৫] এই লৌকিক ভাবনা দেবী চণ্ডীর চার অবতারে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। সেই চারটি অবতার হল — শৃগাল, শকুন, সিংহ ও প্রেত অবতার। তবে সিংহ বাহন চণ্ডীকে পুরাণে পাই। শৃগাল সহ চণ্ডীর মূর্তি পাই বর্ধমানের কলমপুরে। মিহির চৌধুরী কামিল্যা বলেছেন — ''শিয়ালে চড়া নারী মূর্তিও চণ্ডী হয়ে গেছেন কালক্রমে।''[৫৬] চণ্ডীর এই চারটি অবতারে পৌরাণিক রূপের সঙ্গে বর্তমানে লৌকিক ভাবনাও যুক্ত হয়ে আছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী স্বীয় পূজা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত লোভী ও স্বার্থপর চরিত্রের পরিচয় দেয়। সে তার ভক্তকে যেমন সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে তেমনি প্রতিপক্ষ তার পূজা করলে তখন নিজ ভক্তকেও বিপদে ফেলতে তার বাধে না। কালকেতু দেবীর প্রধান ভক্ত। কিন্তু কলিঙ্গরাজ সুরথ তার পূজা করলে তার কাছে ফিরে যেতে তার দ্বিধা নেই।

''দুর্গা বলে কালকেতু শুন মোর বানী।
শোধিলাম তোমার বাদ গৃহে জাহ তুমি।।
ভবানী হৈল বাম কুবুদ্ধি লাগিল।
বিদায় হৈয়া বাক্য বীর তখনি বলিল।।
বিদায় দিলেন মাতা বিদায় হৈলাম আমি।
কেতুর কন্ধ ছাড়িয়া চলিলা নারায়নী।।
জেখানে করএ পূজা সুরথ রাজন।
ঘটে বসিয়া তথা পূজাতে দিল মন।।''[৫৭]

নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কালকেতুকে সে প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে। গুজরাট নগরে তার পূজা প্রচার হলে তাকে সে বিদায় দিয়েছে এবং কলিঙ্গ দেশের প্রতি সে মনোনিবেশ ঘটিয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীর পূজা প্রচার মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পূরণে যতটা স্বার্থের চরম পর্যায়ে

নামতে হয় ততটাই সে করেছে। তার পুত্রবৎ সন্তানের ভবিষ্যৎ করুণ অবস্থার জন্য বিবেক দংশন হয়নি। উপরন্তু সে বলেছে —

''আইস বাছা সুরথ রাজা তোকে দিলাম বর।
ছাড়িলাম বীরের কন্ধ জাইয়া বন্দি কর।।''[৫৮]

দেবী চণ্ডীর এরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান শূন্য, উদ্দেশ্য কায়েমী, লোভী ও স্বার্থপর চরিত্র। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — ''এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই 'প্রসাদোহপি ভয়ংকরঃ;' সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সংগত-অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।''[৫৯] সুরথ রাজের জবানীতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে বন্দী কালকেতুকে বলেছে — ''কার ভরসাএ ভাঙ্গ আমার শাসন।''[৬০] অর্থাৎ কালকেতু যার ভরসায় কলিঙ্গ ভেঙে গুজরাট স্থাপন করেছে, সে তো ভরসাহীন প্রয়োজনসিদ্ধ চরিত্র।

স্বার্থ-সর্বস্ব ও প্রয়োজনসিদ্ধ দেবী চণ্ডীর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা আমাদের অবাক করে। কালকেতু গোধিকা ভ্রমে তাকে বন্দী করে। দেবীর সেই ব্যথার প্রতিশোধ মনুষ্য ব্যাধ কালকেতুর উপর বর্তেছে। দেবী পদ্মাকে বলে —

''দেবি বোলে পদ্মা মুঞি বোলো তোমারে।
গোধিকারূপে গিয়াছিলাম ধন দিবার তরে।।
কিবা মাগিব ধন মুখে বন্দী করে।
সেহিত বন্ধনে প্রাণ চড়চড় করে।।
সেহি দুঃখ ভূঞ্জিব বীর ধুলিয়া কোঠরে।।''[৬১]

পরে এই কালকেতুর বন্দী দশা দেখে চণ্ডীর মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি দেবীর দেবত্ব ক্ষুণ্ণ করেছেন। নরের সঙ্গে দেবীর প্রতিশোধ ভাবনা তাকে মনুষ্যকুলের প্রতিনিধি সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে।

দেবী চণ্ডী কালকেতুকে উদ্ধার করে। পরকালের চিন্তায় কালকেতু ও ফুল্লরা বংশরক্ষার জন্য জাহ্নবীর তীরে চণ্ডী পূজা করতে যায়। এরূপ ইন্দ্রও নদীর ধারে পুত্র সন্তানের জন্য তপস্যা করে। প্রজনন বা উর্বরতার সঙ্গে জল বা নদীর একটি সম্পর্ক রয়েছে। 'দেবখণ্ড'-এ চণ্ডী ইন্দ্রকে ছলনা করতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে জলে জলকেলী করে; আর আখেটিক খণ্ডে কালকেতুকে ছলনা করতে গ্রাম্য গৃহবধূ বা 'বৌহারি' বেশে জলকেলী করে। তার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রকে পুত্র বর দেয় আর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে কালকেতু ও ফুল্লরাকে পুত্র বর থেকে বঞ্চিত করে। এখানেও

তার স্বার্থসর্বস্ব রূপটি স্পষ্ট —

''বৌহারি মূর্ত্তি ধরি মলিন বসন পরি
কলসী কাখেত লইল।।
দেবী জলভরে জলক্রীড়া করে
ডাকিয়া বীরেক বলিল ভবানী।
ছাড়িয়া গৃহবাস ধরিছ পুত্রের আস
সে পুত্র না দিব নারায়নী।।''[৬২]

লক্ষণীয়, কবি চণ্ডীকে দেব খণ্ডে ব্রাহ্মণী রূপে এবং ব্যাধ খণ্ডে গ্রাম্য গৃহবধূ রূপে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে। এখানে ছলনাময়ী চণ্ডীর লৌকিক স্বরূপটি অধিকতর উজ্জ্বল।

'ধনপতি খণ্ড'-এ চণ্ডী পুনরায় আরো চারদিনের পূজা প্রচারে চিন্তিত। তার চিন্তার উপায় করল নারদ মুনি। সে কর্ণমুনিকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামাবার কথা উত্থাপন করে। চণ্ডী কর্ণমুনিকে ছলনার জন্য প্রথমে তার গুরু শিবকে ছলনার কৌশল অবলম্বন করে। শিবের কামুকতাকে কাজে লাগানোর কল্পে দেবী ষোল বৎসরে মোহনীয় রমণীর বেশ ধারণ করে। শিব স্থানে এসে তার কামাকুল চিত্তকে ধাবিত তথা আকর্ষণ করার জন্য দেবী একবার সামনে এসেছে, আর একবার পিছিয়ে গেছে। চণ্ডীর এইরূপ চিত্তহরণ কৌশল অত্যন্ত নাটকীয়। কবি লিখেছেন —

''জৌবন দেখাইয়া দুর্গা পাছাইয়া রহিল।
হস্ত তুলিয়া শিব ডাকিতে লাগিল।।
হাসিতে হাসিতে দুর্গা ক্ষেনেক আগুয়ায়ে।
আপনার বেশ দেখায়ে ক্ষেনেক পাছয়ায়ে।।''[৬৩]

শিব তার মোহনরূপ দেখে যৌবন সম্ভোগে ব্যাকুল হয়। সেই সুযোগে সে প্রচলিত একটি প্রবাদ বলে — ''সাধিলে আপন কার্য্য কার কেহু নয়ে।''[৬৪] গভীর তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে দেবী চণ্ডী শিবকে তার কন্যা মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারের কথা উল্লেখ করে। একথা শুনে শিব তার উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করবে। সত্যিই তাই হয়। সেই সুযোগে দেবী চণ্ডী শিবের সঙ্গে পাশা খেলায় কর্ণমুনিকে সাক্ষী রাখে এবং শর্ত করে — ''জদি হারিবে প্রভু দেব ত্রিলোচন।/ ইহ সাক্ষী দিলে হবে নরকে গমন।।''[৬৫] পাশা খেলায় শিব জয় লাভ করে। তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য চণ্ডী কর্ণমুনিকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে প্ররোচনা করে। মিথ্যা সাক্ষী দিতে অনিচ্ছুক কর্ণমুনিকে দেবী তার পূর্ব সুকীর্তিকে লোভনীয় রূপে উদাহরণ স্বরূপ তার সম্মুখে পরিবেশন করে। যাতে কর্ণমুনি গুরুর বিপক্ষে সাক্ষী দিতে ও মর্ত্যে যেতে রাজী হয়। চণ্ডী কর্ণমুনিকে বলে —

''সেবক করিয়া জদি চিন্তা থাকে তারে।/ পুত্র হেতু তপস্যা করে কামনা সাগরে।।

মৎস বাসা করিয়াছিল উরাথ ভিতরে।/ নানা মত ক্লেশ পায়ে দেব শরীরে।।
দেখিয়া তাহার দুঃখ ধরাইতে নারিনু।/ ইন্দ্রেক ছলিয়া তাক পুত্র বর দিনু।।
ইন্দ্রের ঘরে পুত্র হইল নাম নীলাম্বর।/ শিব তাকে শাপ দিল বড় দুরাক্ষর।।
শিবের শাপে জন্ম তার চাম দড়িয়ার ঘরে।/ আমি তারে বাড়াইলাম গুজরাট নগরে।।
রাজ বৈভোগ করি মৃত্যু হৈল তারে।/ তাহা হৈতে চারিদিনের ব্রত হৈল মোরে।।''[৬৬]

চণ্ডী তাকে এই সকল কথায় ভুলিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে। সেই সঙ্গে দেবী তাকে অর্থধন-কুলগৌরবের লোভ দেখিয়েছে। সেবক হয়ে কর্ণমুনির মনে এই লোভনীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি সুপ্ত থাকা স্বাভাবিক। সেই সুপ্ত বাসনাকে চণ্ডী কাজে লাগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কর্ণমুনি মিথ্যা সাক্ষী দিলে শিব কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য সফল হয়। এখানে চণ্ডীর বুদ্ধিমত্তা এবং চরিত্রের দুর্বল চিত্তের মনোবাঞ্ছাকে নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূলে করে নিয়েছে। এখানে তাকে আধুনিক কৌশলী মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র বলে মনে হয়। মধ্যযুগে দাঁড়িয়েও মানিক দত্তের চণ্ডী চরিত্রটি বর্তমানে প্রশংসার দাবী রাখে।

চণ্ডী ক্রুদ্ধ চরিত্র বটে। তবে দেবীর আশির্বাদে ধনপতি ও লহনা মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করল। লহনা বাল্য বয়স থেকে ভালো ঘর, বর, কুল পাওয়ার জন্য দেবীর পূজা করে। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে দেবীর কথা ভুলে যায়। চণ্ডী তাকে নিঃসন্তান ও সতীন জ্বালার অভিশাপ দেয়।

''কোপ দৃষ্টে শাপ দিল ত্রিপুরা ভবানী।
আমার শাপে হউক তোর দারুণ সতিনী।।
তোর কোলে জেন না হয়ে বংশধর।
বাঞ্ছা হৈয়া থাক তুমি পৃথিবী ভিতর।।''[৬৭]

দেবী চণ্ডী তার ভক্তকেও একটু তোষামোদের অভাব ঘটলে ছাড়েনি। তাকে অন্যের দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়ে ছেড়েছে। সে লহনাকেও সেই পথে ঠেলে দিয়েছে।

লহনার দ্বারা পূজা প্রচার ব্যর্থ হলে চণ্ডী চিন্তিত হয়। নারদের পরামর্শে স্বর্গের রত্নমালাকে ইন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত করায়। রত্নমালার মর্ত্যে খুল্লনা নামে জন্ম হয়। তাকে দিয়ে পূজা প্রচারের জন্য রাজা বিক্রমকেশরকে স্বপ্ন দেখায়। যাতে রাজা আটকুড়া অপবাদে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য করে। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে রাজা ধনপতিকে বন্দী করে। দেবী তখন চিন্তিত হয়ে বলে —

''কিরূপে গৌড়ে জাবে সাধু ধনপতি।।
কিরূপে চরাবে ছেলি সুন্দর খুলনা।
এই কথা দুর্গা মাতা করিছে মন্ত্রনা।।''[৬৮]

অতঃপর পদ্মার কথায় সে শারী ও শুকের জন্ম করায়। শারী-শুকের পিঞ্জরের জন্য ধনপতি গৌড়ে যাত্রা করে। এই সুযোগে লহনা সতীনের উপর অত্যাচার করার জন্য এবং নিজের বিগত যৌবন লক্ষ্য করে সুন্দরী খুল্লনাকে ছাগল চরাতে পাঠায়। সেই ছাগলকে চণ্ডী সেজানু পর্বতে লুকিয়ে রাখে। নিদ্রা থেকে জেগে খুল্লনা ছাগল না পেয়ে হতাশ চিত্তে বনে ঘুরে বেড়ায়। সেই দুঃখে সে নিজেকে বনের বাঘ ও ভাল্লুকের কাছে জীবন সমর্পণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তারা চণ্ডীর ব্রতদাসী বলে তাকে ভক্ষণ করে না। সেই মুহূর্তে খুল্লনা পঞ্চবিদ্যাধরীদের দেখে বটবৃক্ষের তলে চণ্ডীপূজা করে। খুল্লনা দেবীর স্থানে স্বীয় দুঃখ জানায়। চণ্ডী তার দুঃখের কথা শুনে ভাবতে থাকে। শেষে ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে দুর্গা তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এখানে সে অরণ্যদেবী।

''ব্রাহ্মণীর রূপে দুর্গা আল্য মর্থলোকে।
অরন্যে আসিয়া কথা বলে খুলনাকে।।''[৬৯]

ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডী চতুর। সে খুল্লনার মনকে পরখ করে নিয়েছে। তার প্রতি খুল্লনার ভক্তি ও নিষ্ঠা কতখানি তা পরখ করতে সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের পূজার কথা বলে। একথা শুনে খুল্লনা তার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রকাশ করে। তাতে সে তুষ্ট হয়। তাকে সমস্ত ছাগল ফিরিয়ে দেয়। সে বাঘ, ভাল্লুক, সর্প, ছাগল প্রভৃতি পশু জীবের দেবী। ব্যাধ খণ্ডে তাকে এমন ভাবে পশুদের সঙ্গে একাত্ম হতে দেখা যায় নি। কিন্তু 'ধনপতি খণ্ড'-এ তার এই স্বরূপ তাকে অরণ্যানী ও পশুদেবী রূপেই পরিচয় প্রদান করে। তার স্বরূপ খুল্লনা ও পশুদের কথায় বোঝা যায় —

''ছেলির প্রসাদে আমি দেখিলাঙ দুর্গাকে।।
* * *
বাঘ ভালুক সর্প বোলে জদি আজ্ঞা পাই।
লহনা বাঞ্জির মুণ্ড শীঘ্র ছিণ্ডি খাই।।''[৭০]

দেবী চণ্ডী নিজেই ভক্তের মঙ্গল উদ্দেশ্যে লহনাকে প্রাণ নাশের হুমকী দিয়েছে। খুল্লনা ও ধনপতিকে মিলনের জন্য সে তাদের মন চঞ্চল করেছে। প্রথমে খুল্লনার কাছে শ্বেত কোকিল রূপে যৌবন জ্বালা জাগ্রত করেছে এবং পরক্ষণে শ্বেত কাক রূপে খুল্লনার দুঃখ বেদনা গৌড়ে ধনপতির কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

দেবী চণ্ডী কতটা ভক্তবৎসল তার পরিচয় পাই খুল্লনার 'জৌঘর' পরীক্ষার সময়। তবে কবি তাকে দেবীত্বগুণ থেকে একেবারে ছিন্ন করেছেন। তাকে সঙ্কটাপন্ন সন্তান রক্ষায় ব্যাকুলা মাতা রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। চণ্ডী-ভক্ত খুল্লনার মরণাপন্ন অবস্থা দেখে শোকাকুলা মাতার ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে চণ্ডী প্রতিদ্বন্দ্বী শিবের স্থানে আসতে বাধ্য হয়।

''রক্ষা করিতে মাতা চলিল ত্বরিতে।
ঘরে না জাইতে পারে অগ্নির জ্বালাতে।।
পরীক্ষা ছাড়িঞা মাতা গমন করিল।
কান্দিতে ২ মাতা শিব স্থানে গেল।।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরে সুন্দর খুলনী।
আমার দাসীর প্রাণ রাখ শূলপাণি।।''[৭১]

শুধু তাই নয়, ধনপতির সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা তার স্মরণে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে ভক্তের বিপদ আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। সত্ত্বর পঞ্চদাসী সহ তার কাছে উপস্থিত হয়। সুতরাং চণ্ডী এখানে ভক্তবাৎসল্যের সঙ্গে মাতৃবাৎসল্যে পরিপূর্ণ চরিত্র।

কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতির সিংহল যাত্রা পথে মগরাতে চণ্ডীর 'কমলে কামিনী' রূপ স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। সে ধনপতিকে ছলনা করার জন্য কমলের বা পদ্মের ডালে ও পদ্ম পাতায় রূপান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে সে হাতি বা গজ খাচ্ছে এবং সেটাকে উগরে ফেলছে। চণ্ডী তার রূপের দ্বারা ধনপতিকে আকর্ষিত করিয়েছে। কবির বর্ণনায় —

''কমলের ডাণ্ডি হৈল জগতের মাতা।/ মায়ারূপে হইলেন কমলের পাতা।।
জলখাত্যে আল্য ইন্দ্রের গজরায়।/ বামহস্তে ধরি মাতা তাহাকে ফিরাএ।।
বামহস্তে গজ লঞা দক্ষিনে গরাসে।/ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সাধুর তরাসে।।
সাধু বলে শুন ভাই জতেক গাবর।/ কন্যাকে ধরিঞা তোল নোকার উপর।।
অপূর্ব্ব দেখিএ এই কন্যা রূপবতী।/ তিলোত্তমা হএ কিবা ইন্দ্রের যুবতী।।
কামিনী কমল গজ দেখ সর্ব্বজন।/ কহিবে রাজার স্থানে এই বিবরণ।।
চাকর নফর কহে ভাণ্ডারি কণ্ডারি।/ আমরা না দেখি গজ কমল কুমারি।।''[৭২]

মানিক দত্তের চণ্ডীর এই রূপ দেখে সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মের সৃষ্টির সঙ্গে দেবীর 'কমলে কামিনী' রূপের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে — ''ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে যে কমলে-কামিনীর গজ গ্রাস ও বমনের ব্যাপার আছে তাহা ধর্ম্ম-ঠাকুরের সৃষ্টিলীলার রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম হইতেছেন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম; বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে ধর্ম্ম আদিদেব এবং সৃষ্টিকর্ত্তা; মোঙ্গ লদেশের প্রভাবে ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া আদ্যাশক্তিরূপে গণ্য হইতে থাকেন। ... সমুদ্রে কমলাসনা দেবীর মুখ হইতে গজ নির্গত হওয়ার ব্যাপারে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যের ও কমলে কামিনী আবির্ভাবের সমান ঘটনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, তিনি বৌদ্ধ দেবতার রূপান্তর মাত্র।''[৭৩] তিনি ধর্মের পদ্মফুল সৃষ্টির সঙ্গে দেবীর কমলের ডাণ্ডি ও কমল পাতায় পরিণত হওয়ার, ধর্মের গজ মূর্তিরূপ ধারণ করার সঙ্গে দেবীর গজ গেলা

ও উগরানোর সঙ্গে সাদৃশ্য রচনা করে ধর্মকেই বৌদ্ধ চণ্ডীর কস্তুরী রূপান্তর বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় দেবী চণ্ডীর কমলে কামিনী রূপ লক্ষ্মী মনসার মিলিত স্বতন্ত্র রূপ। প্রথমত, ধর্মের পদ্মফুল সৃষ্টি এবং দেবীর কমলের ডাণ্ডি ও পাতায় পরিণত এক বিষয় নয়। ধর্ম পদ্ম ফুল সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীতে মৃত্তিকা সৃষ্টি করার জন্য। আর কমলে কামিনী রূপ ধারণ করেছিল ধনপতির মন হরণ করার জন্য। অর্থাৎ দেবীর সৌন্দর্যে বা রূপে মোহিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। তবে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ধর্ম ও দেবীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তুলনায় দেবীর এই রূপের সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর মিল রয়েছে বেশি। এই কাব্যে অন্য স্থানে চণ্ডীর বৃদ্ধা রূপ পাই। কিন্তু এখানে সে যুবতী কন্যা। সুকুমার সেন সঙ্গত কারণেই বলেছেন — ''কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে বুড়ী অভয়া চণ্ডীর কোন দিকেই তো কোন মিল নেই। কমলে-কামিনী-কুঞ্জর হলেন মোহিনী দেবতা শ্রীমতী। শ্রীর প্রতীক পদ্ম তাঁর আলয়। ফাঁদ পাতা ওঁর পুরুষের জন্যেই।''[৭৪] দেবীর মোহিনী রূপের পরিচয় ধনপতির কথায় স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মের গজরূপ ধারণের সঙ্গে দেবীর গজ গেলা ও উগরানোর কোন সাদৃশ্য নেই। কেননা, বৌদ্ধ স্থাপত্যে জলের মধ্যে পদ্মাসীনা নারীমূর্তির মাথার উপর হাতি জল ঢালছে — এ ধরনের মূর্তি পাওয়া যায়। এই দেবী পরে গজলক্ষ্মী নামে পূজিত হয়। সুকুমার সেনের মতে — ''গজলক্ষ্মী মূর্তি কমলে-কামিনী-কুঞ্জরে মূর্তির শোভন সংস্করণ ...।''[৭৫] এবং রোমান লেখক তাকিতূস্ (Tacitus)-এর 'গের্মানিয়া' (Germania) বইয়ে বর্ণিত দেবীর সঙ্গে মানিক দত্তের কমলে কামিনীর সাদৃশ্য রয়েছে। সেই দেবীর অধিষ্ঠান সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে। সেখানে রয়েছে মনোরম কুঞ্জবন। এই দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে মনসার মিল আছে। মনসার উৎপত্তি জলমধ্যে পদ্মনালে, তাই তার আর এক নাম পদ্মা। আবার লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, অধিষ্ঠান পদ্মের উপরে, তাই তারও নামান্তর পদ্মা। এছাড়া দেবীর গজ বা হাতি গেলা উগরানো অস্বাভাবিক। তাই সাপ গেলা ও উগরে ফেলা অনেক সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। তাই মনে হয় দেবীর কমলে কামিনী রূপ মনসা ও লক্ষ্মীর মিলিত স্বতন্ত্র মূর্তি। সুকুমার সেনের মতে — ''খুল্লনার পতি ও পুত্র সমুদ্রে বাণিজ্যযাত্রা-পথে কালিদহে যে কমলে-কামিনী দেবীকে দেখিয়াছিল তিনি দুর্গা-চণ্ডী-অভয়া নহেন। তিনি দেবীর প্রাচীনতর রূপভেদ দুর্গা-মনসা-কমলার বেশান্তর।''[৭৬]

অতঃপর চণ্ডী চরিত্রের তেমন সক্রিয় ভূমিকা নেই। কবি তাকে কাহিনী অগ্রগতির ও যোগসূত্র রচনার জন্য এনেছেন। যেমন, শ্রীমন্ত সিংহল রাজের কাছে যখন বাণিজ্য দ্রব্য বিনিময় করে তখন তার আবির্ভাব, কারণ তার মনে হয়েছে শ্রীমন্তের বাণিজ্য করে চলে গেলে কীভাবে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সুশীলার সঙ্গে বিবাহ হবে। এই জন্য দেবী চণ্ডী রাজা শালবানকে স্বপ্ন দেখায় মিথ্যা শ্রীমন্তের কপটতা বিষয়ে। তাহলে শ্রীমন্ত বন্দী হবে এবং দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য পূরণ

হবে। বন্দী শ্রীমন্তকে মশানে মুণ্ডচ্ছেদন করতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দেবী চণ্ডী কোতালের কাছ থেকে তাকে দান স্বরূপ নিয়েছে। এখানে তার স্নেহবৎসলরূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।

''শ্রীমন্ত বসিঞা ছিল বকুলের তলে।
নাতি বলি দুর্গা শ্রীমন্ত লৈল কোলে।।''[৭৭]

দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত শর্তে জয়লাভ করে। সে সময় শ্রীমন্তের হাত ধরে রাখে। শ্রীমন্ত স্বর্গে চলে গেলে তার ব্রত সম্পন্ন হবে না। এখানেও তার শ্রীমন্তের প্রতি আচরণ স্নেহের ও প্রীতিসম্পন্ন।

''গলে তুলে দেএ সাধু নবসান কাতি।
সাধুর হস্ত ধরি রাখে অভয় পার্ব্বতী।।''[৭৮]

এখানে দেবী চণ্ডীর দেবত্বের তুলনায় স্নেহবৎসল নারী স্বরূপটি বেশি স্পষ্ট। কবি চণ্ডীকে কেবল দেবী করেই রেখেছেন দেবখণ্ডে। এখানে তার পুরাণ স্বভাবটি বড় হয়ে উঠেছে। তবে ব্যাধ ও বণিক খণ্ডে সে মূলত মানবী। স্বীয় পূজা প্রচারের উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে তার ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন হলেও ভক্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্নেহময়ী নারীর মত।

এই দেবী চণ্ডীর স্বামী **শিব**। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম দেব চরিত্র হিসাবে সে অন্যতম। কাব্যের মূল উদ্দেশ্য চণ্ডীকে নিয়ে আবর্তিত হলেও কাহিনীর দ্বন্দ্ব ও সজীবতা সৃষ্টিতে শিব চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে শিব এতটাই জনপ্রিয় দেবতা যে তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেব-ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যাবে। সেই দিক দিয়ে শিব চরিত্রটি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাসঙ্গিক।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব প্রধান পুরুষ দেবতা। কাহিনী ধারায় তার বেশি উপস্থিতি দেবখণ্ডে। আদি দেব নিরঞ্জনের বীর্য হতে তার জন্ম হয়েছে। প্রসঙ্গত, সে আদি দেবতা নয়। তবে তার জন্ম সাধারণ মানবের মত কোন নারীর গর্ভ হতে নয়; দেবতা বলেই তার জন্মে অলৌকিক ভাবনার সঞ্চার ঘটেছে।

''তিন ভাগ করি বির্জ্জ তিন ঠাই থুইল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের জন্ম হৈল।।''[৭৯]

শিব কঠোর যোগী-তপস্বী; পিতা ধর্মের মৃত দেহরূপ ছদ্মবেশ ধারণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু চিনতে না পারলেও ধ্যানরত শিব চিনতে পেরেছিল। পিতার ও উলুকের কথা মত সে আদ্যাকে বিবাহ করে। পিত্রাদেশ ও পিতার প্রতি কর্তব্য এড়ানোর তার উপায় ছিল না। শিব তার উরুতে নিয়ে পিতাকে দাহন করে। সে পিতার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মত 'মাতা' বলে পিত্রাদেশ এড়িয়ে যেতে পারে নি। তবে সে আদ্যার সপ্তবার মৃত্যুর এবং প্রমাণ স্বরূপ একটি করে হাড় গলায়

পরিধানে ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

''সাতবার মরিব সাতখান হার লব
হাড়মালা গলএ পড়িব
আদ্যা দেহা ছাড়িঞা পুনুজন্ম লঅ গিঞা
তবে তাকে বিবাহ করিবো।''[৮০]

শিব মাতা আদ্যার পুনঃজন্মকে বিবাহের ক্ষেত্রে মেনে নেয়। তা সত্ত্বেও, আদ্যা রূপে গৌরীর জন্ম লাভের পরেও তাকে শিবের কাছে কঠোর তপস্যার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এখানে গৌরীর হর-প্রাপ্তির প্রচলিত কাহিনীকে শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তার ফলে শিব এখানে হৃদয়হীন কঠোর চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর অসুরবর্গের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দেবতাগণ শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহের পরিকল্পনা করে। তাদের পুত্র কার্তিক সেই অসুরদের বিনাশ করবে। এই পরিকল্পনা সাফল্য করতে ও ধ্যানস্থ শিবকে জাগ্রত করতে কামদেবকে পাঠানো হয়। কামদেবের কামবানে তার ধ্যান ভঙ্গ হয়। তাতে শিব অত্যন্ত রুদ্র মূর্তি ধারণ করে ও ক্রোধে কামদেবকে ভস্ম করে।

''ধ্যানভঙ্গ হঞা শিব চক্ষু তুলি দেখিল।
শিবের ক্রোধে কামদেব ভস্ম হৈঞা গেল।।''[৮১]

শিবের এই রুদ্র ও ক্রোধী চরিত্রের পাশে সে কৌতুকপ্রবণ এবং আত্মগুণগান অন্যের মুখে শুনতে উৎসাহী। শিব গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে যেকোন বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার একথা শুনে দুর্গা স্বামীরূপে তাকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই সময় শিব তাকে স্বামী বর দিয়েও অত্যন্ত কৌতুকে ও আত্মসন্তুষ্টির জন্য নিজ গুণগান শুনে এবং বলে —

''ভিক্ষা করি খাই দারিদ্র বোলে লোকে।
কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে।।''[৮২]

যখন দুর্গা তাকে সকল দেবতার উর্দ্ধে স্থাপন করে বলে — ''কে বলে দারিদ্র তুমাক পুজে দেবলোকে।''[৮৩] সে ভিখারী নয়; সে সর্বোচ্চ দেবতা। দুর্গার দ্বারা এই মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। অল্প প্রসংশায় তার মন টলে যায়। আত্মগৌরবে আনন্দ অনুভবকারী শিব দেব-মানবের চরিত্রগুণে একাকার হয়ে গেছে।

আবার শিবের বিবাহ বিষয়ে কবি তাকে লৌকিক সাধারণ মানুষ রূপে এঁকেছেন। গৌরীর কাছ থেকে দেবাধিপতি রূপে জানলেও বিবাহ বিষয়ে শিব সাধারণ দরিদ্র মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। তার বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়েছে দেবসমাজ। সেই দেবসমাজ তার বিবাহে এসেছে অথচ সে

ভূত-প্রেত নিয়ে সর্বদা শ্মশানে থাকায় সকলে অন্নজল গ্রহণ করতে নারাজ।

''সকল দেবতাগণ মন্ত্রনা করিল।
শিবের আগে দেবগণ বলিতে লাগিল।।
প্রেত ভূত লঞা শিব থাক শ্মশানতে।
অন্নজল কে খাইবে তুমার গৃহতে।।''[৮৪]

শিবের চরিত্রে উচ্চবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর সংমিশ্রণ খুব সুন্দর ভাবে কবি করেছেন। সেই সঙ্গে চরিত্রটির দ্বারা সেকালের সমাজাভাস পাওয়া যায়। তার বিবাহে দেবী গঙ্গাকে দিয়ে রন্ধন করলে তবেই দেবতারা অন্ন গ্রহণ করবে। তাই সে গঙ্গাকে শান্তনুর কাছ থেকে একরাতের জন্য শর্ত করে আনে। কিন্তু নারদ কর্তৃক ঝগড়ার জন্য বিবাহ সভায় তাকে হেনস্তা হতে হয়। স্বভাবতই, শর্ত ভঙ্গ হলে, শান্তনু গঙ্গাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সমাজ তথা স্বামী কর্তৃক গঙ্গা অস্বীকৃত হলে তার মত নারীর নীরব ক্রন্দনে চোখ ভেজানো ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এই রূপ অবস্থার কাছে শিব অসহায়। দেবশ্রেণীর কূটচক্রের সে শিকার। অন্যদিকে, অসহায়, গৃহচ্যুত নারীর বেদনা তার হৃদয় স্পর্শ করে। তাই সে দুর্গাকে বিবাহের পূর্বেই অন্যের স্ত্রী গঙ্গাকে শিরে স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

''কথা শুনি কান্দে গঙ্গা মুনির সাক্ষাতে।
শিব বোলে গঙ্গা তোকে থুব আমি মাথে।।''[৮৫]

গঙ্গাকে কৈলাসে নিয়ে আসার পর সে অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী নারদ কর্তৃক প্রেরণ করে। এদিকে মেনকা ''বিধি করে বেদ মতে''[৮৬] বিবাহের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটিয়েছে। আর শিব বিবাহ করতে যাবার জন্য বৃষ সাজাতে বলেছে। সে গলায় হাড় মালা, শিরে সর্প, তার মাঝে গঙ্গা, শিঙ্গা বেণুসহ লক্ষ লক্ষ ভূত প্রেত নিয়ে বিবাহে রওনা দেয়। শিবের এই রূপ অত্যন্ত কৌতুককর। তাকে আপাত দৃষ্টিতে অনার্য শ্রেণীর চরিত্র বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য মনে আসে — ''আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী-বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই।''[৮৭] ষাঁড় নিয়ে, সর্প মাথায় ও ভূত-প্রেতসহ শিব এই পরিচয় ব্যক্ত করে। তবে লক্ষণীয়, মেনকার বিবাহ আয়োজনে আর্য রীতির কথা উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাবে 'বেদ মতে'। তাহলে কবি কী শিব চরিত্রের অঙ্কনে এখানে বিপরীত সংস্কৃতির মিলন দেখাতে চেয়েছেন? কাব্যের দিকে লক্ষ্য রেখে চরিত্রটিকে একটু অন্য ভাবে বিশ্লেষণ করলে কবির অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় বুঝতে পারব। তার পূর্বে কবির কথা শুনে নেওয়া যাক্ —

''শিব বলে নন্দীরে সাজাহ বৃষের তরে
বৃষকে সাজাহ ভালমতে।।
নন্দী শিবের আজ্ঞা পাল্য বৃষের সাজন কৈল
বৃষ দিল শিবের সাক্ষাতে।
শিব সাজে বিবাহতে হাড় মালা গলাতে
সর্প্প য়াছে শিবের জটাতে।।
গঙ্গা য়াছে জটা মাঝে নানা মতে শিব সাজে
কুণ্ডল পহ্রিল গলাতে।
শিঙ্গা বেনু হাতে নিল বৃষ পৃষ্ঠে চড়িল
সকলিকে কহিল সাজিতে।।
দানা সাজে লক্ষজন প্রেত ভূত জনে জন
দেব আদি সাজে মুনিগণ।''[৮৮]

বেদের যুগে শিব রুদ্র। তাই রুদ্র শিবের বাহন বৃষ্ণ বা বৃষ। পুরাণ দেব-দেবী গবেষক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''বৃষ কেবল শিবের বাহন নয়, বৃষ শিবের প্রতীকও।''[৮৯] কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বলেছেন — ''তস্থৌ বৃষভাঙ্কাগমনপ্রতীক্ষা।''[৯০] অর্থাৎ ''বৃষাঙ্কের আগমনে (শিব) প্রতীক্ষা করে রইল।''[৯০] সর্প শিবের জটাতে। 'সৃপ্' শব্দ থেকে সর্প কথাটি এসেছে। যার অর্থ গমন বা গতি বোঝানো হয়। শিবের বিবাহ যাত্রায় এই রূপটি যথাযথ। সর্প তার জটা বন্ধন রজ্জু ''ভৃজঙ্গমোন্নদ্ধ-জটাকলাপঃ''[৯১] অর্থাৎ, ''তাহার জটাজূট কালসর্পের দ্বারা চূড়ার মত উন্নত করিয়া আবদ্ধ।''[৯১] অন্যদিকে, শিব সকল জীবের অধিপতি এবং সর্বজীবে সে বিরাজমান, সে সকল জীবের উদ্ভব। তাই সে ভূতপতি ভূতনাথ। সে সর্বভূতের অধিপতি হওয়ায় সে ছোট- বড়-বৃদ্ধ-তস্কর-প্রবঞ্চক প্রভৃতি সকল ভূতের অধিপতি। লক্ষণীয়, যদি তার অনার্য রীতিতে বিবাহ হত তাহলে সেকালের সমাজ শিবের বিবাহে 'দেব আদি সাজে মুনিগণ' যেত না। সুতরাং বিবাহ সজ্জায় শিবকে কবি আর্য-ভাবনার সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রিত দেবতা রূপেই অঙ্কণ করেছেন।

বিবাহ সভায় শিবের আচরণ শিশুসুলভ। সকলের সামনে উলঙ্গ হওয়া তার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও কৌতুকপ্রবণতার পরিচয়। তার মাথায় সর্প, হাতে ডমরু, চারিদিকে ভূত-প্রেত, গলায় হাড়-মালা এবং কথা বলতে তার দাঁত নড়ে — এই রূপ শিবকে বৃদ্ধ বাদিয়া বলে মনে হয়।

''এতেক নাঙ্গটা শিব মাথে সাপের জটা।
বর নহে এই শিব বাদিয়ার বেটা।।

শিবকে দেখি নারীগণ দূরতে পলায়।
শাশুড়ের আগে শিব ডমরু বাজায়।।
বুড়ার বেশ হঞা শিব হাসি২ পড়ে।
কথা কহিতে শিবের দন্ত গোলা নড়ে।।
প্রেত ভূত সঙ্গে শিব নাচে চারিপাশে।
শিবের চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে।।''[৯২]

এখানে শিব লৌকিক মানুষ। প্রসঙ্গত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'-এর শিব চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলেছেন তা বোধ হয় মানিক দত্তের শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে বেশি প্রণিধানযোগ্য — ''মাথায় জটা ও ফণী, গলায় মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গায়ে মাখা ছাই — এমন একটি ভিখারীর রূপ দেখিয়াছি আমরা আমাদের সমাজে কোথায়? — একটি বেদিয়ার ভিতরে।''[৯৩] মেনকার কথায় তাকে বাদিয়া বলে মনে হয়। মেনকা কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর ও অঝোর ধারায় ক্রন্দন করছে। শাশুড়ি মেনকা শিবের অদ্ভুত রূপ সম্পর্কে নিন্দা করলে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। লজ্জায় শিব সম্পূর্ণ বিপরীত যুবক রূপ ধারণ করে। এখানে শিব আদি দেবতা; তাই সে অতিবৃদ্ধ ও চিরনতুন। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি সূর্যাগ্নির সঙ্গে তার রূপের তুলনা করে বলেছেন — ''বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বর্তমান থাকায় সূর্যাগ্নি যেমন সকলের জ্যেষ্ঠ, তেমনি প্রতিদিন নূতনরূপে জন্ম নেওয়ায় তরুণও। শিব তাই কখনও বৃদ্ধ — কখনও তরুণ।''[৯৪] ব্রাহ্মণ পিতৃপুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করলে তার আচরণে তাকে দেবাদিদেব মহাদেব বলে মনে হয়।

''শিবের পিতৃগণের নাম জিজ্ঞাসিল।
ব্রহ্মার পানে চাঞা শিব হাসিতে লাগিল।''[৯৫]

তার বিপরীত রূপ ধারণে কবি তাকে দেব রূপে অঙ্কন করেছেন। তাতে মনে হয়, কবি চরিত্রটির পরিবর্তনের সঙ্গে তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

কবি তার চরিত্রকে কামুক রূপে চিত্রিত করেছেন। সে ইন্দ্রিয়-দুর্বল চরিত্র। দুর্গা পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচজন দাসী আনলে তাদের দেখে শিবের কাম জাগ্রত হয়।

''জেন মাত্র মহাদেব দাসীকে দেখিল।
মদনে বিভোর হৈঞা সাক্ষাতে আইল।।''[৯৬]

কামোত্তেজিত শিবকে আত্মস্থ করতে দুর্গা দেবসমাজের ভয় দেখায়। তবুও শিব যেনতেন প্রকারেণ দাসীদেরকে নিজের ভোগের সামগ্রী করেছে।

তা সত্ত্বেও, সে স্ত্রী পরায়ণ। স্ত্রীর সম্মুখ বিপদে সে শঙ্কিত। অপরাক্রমশীল অসুর

ধূম্রলোচনের সঙ্গে স্ত্রী দুর্গার যুদ্ধের খবর পেয়ে সে চক্র ও বাণ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছায় এবং স্ত্রীকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। স্ত্রী পরায়ণতার সঙ্গে শিব পশুপতি। দুর্গা তার পূজা প্রচারের জন্য পশুদের বসবাস ও খাদ্যের প্রতিকূল পরিবেশ তৈরী করে। শিব মর্ত্য ভূমিতে যাওয়ার সময় অনাথ পশুদের করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে। তাদের কল্যাণের জন্য সে অত্যন্ত সচেতন ও চিন্তিত। প্রসঙ্গত, সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন — ''শিব নামের অর্থ হল কল্যাণকারী, ...।''[৯৭] সেই প্রকল্পে শিব বলি রাজার থেকে বীজ নিয়ে নিজেই তা ছিটিয়েছে ও রোপন করেছে। শিবকে এখানে কৃষক বলে মনে হয়। কৃষক শিব প্রয়োজনে সংসারের দৈন্য ঘোঁচাতে ভিক্ষা বৃত্তিতে যায়।

''গৃহেত সম্বল নাই মনে কৈল গোসাই
ভিক্ষারূপে বিদেশে কৈল মতি।।''[৯৮]

সে কোচবধূ, গোপগণ, সূত্রধর গৃহ থেকে ভিক্ষা করে গৃহে ফেরে। বেলা দুই প্রহরে গৃহে ফিরে পুত্রদের মুখ দেখলে তার পিতৃ হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদারন্নের জন্য দুই ভাই কোন্দলে ব্যস্ত হয়। সেই সময় শিব গৌরীকেও জানিয়ে দেয় —

''শিব বোলে রিশীর ঝি পুত্রেক প্রবোধিব কী
কন্দল করএ কি কারণ।
পুত্রেক প্রবোধ করি রন্ধন চড়ান গৌরী
সুখে আজি করিব ভোজন।।''[৯৯]

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তার গৃহীরূপ খুব ক্ষণস্থায়ী। তারপর কাহিনী সংসার জীবন থেকে পূজা প্রচারের দিকে মোড় নেয়। শুণু হয় শিব-দুর্গার দ্বন্দ্ব। দুর্গা তার পূজা প্রচারের জন্য শিবের শিষ্য ইন্দ্রকে ছলনা করে পুত্রবর দেয়। সে ইন্দ্রকে বলে —

''শিবের সেবা ছাড় দুর্গার সেবা কর
পুত্র দিবেন নারায়নী।।''[১০০]

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে নিয়ে উভয়ের লড়াই শুরু হয়। প্রসঙ্গত, নিজের স্বার্থে শিব নীলাম্বর চরিত্রকে একটি পুতুলে পরিণত করেছে। এইরূপ স্বাথান্বেষী চরিত্র শিব।

বস্তুত, শিবকে কবি পুরাণ ও লৌকিক তথা আর্য-অনার্য সংস্কৃতির প্রতিভূ রূপে আঁকতে চেয়েছেন। কখনো কবি পুরাণকে প্রাধান্য দেবার জন্য চরিত্রটিকে অপরিকল্পিত ভাবে ঘটনার আবর্তে ফেলে দিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি ঘটনার মুখাপেক্ষী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি শিবের পুরাণ গুণের সঙ্গে তার শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মাটির গন্ধ। তবে কোথাও কোথাও চরিত্রটির সঙ্গে ঘটনার বা পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। যেমন, বিবাহের পূর্বে শিব কর্তৃক শ্বশুর বাড়িতে প্রেরিত দ্রব্যাদি লক্ষ্য করলে তাকে অতি ধনী ব্যক্তি

বলে মনে হয়। সেই শিব বিবাহ সভায় অতি বৃদ্ধ, অতি দরিদ্র বাদিয়ায় পরিণত হয়েছে। শিব বাঙালী সমাজে গুরুগম্ভীর চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়নি। প্রসঙ্গত, মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষক ক্ষেত্র গুপ্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শিব চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের শিব চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''বাংলা কাব্যে শিব 'সিরিয়াস' নয়, কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজের ভাঁড় রূপেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না।''[১০১] তার ফলে মানিক দত্তের শিব চরিত্র একটি মিশ্র সামাজিক সংস্কৃতির প্রতিভূ রূপে পরিণত হয়েছে। অনুকূল অবস্থার বা পরিস্থিতির বৈপরীত্যে নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার শক্তি কবি তার ব্যক্তিত্বে সঞ্চার করতে পারেন নি।

শিবের পিতা **ধর্ম**। সে দেবখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অপ্রধান দেব-চরিত্র। এই কাব্যে তার অবস্থান খুব সামান্য পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এই চরিত্রটির দ্বারা কবি এই কাব্যের মূল ধর্ম নীতির একটি ধারার শুভ বীজ বপন করেছেন। সেটি হল — বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মের ধারা। ধর্ম চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর কাব্যের দুই ধর্মের তথা আর্য ও অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণ দেখিয়েছেন। সেই কারণে চরিত্রটিকে কবির দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করতে হবে। চরিত্রটির মধ্যে যুক্তি-তর্কের দিকটি খুঁজতে হলে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে। কাজেই ধর্ম চরিত্রকে ঘটনার স্রোতে বা কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তাহলে, কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের সামঞ্জস্য পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

ধর্মের অপর নাম নিরঞ্জন। 'নির' ও 'অঞ্জন' সংযোগে নিরঞ্জন; যার অর্থ হল কালিমাশূন্য। ধর্ম কথাটি এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হল ধারণ করা। শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে। সে আদিতে নিরাকার ও শূন্যরূপী ছিল। তাই সুকুমার সেন বলেছেন — ''ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। ... এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র। ধর্ম-দেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে সাদা প্যাঁচা বা সাদা কাক।''[১০২] কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

''বাপের বিজ্জ জন্ম নইল না ধরিল মাএ।
শূন্যতে জন্মিল ধর্ম্ম মাংস পিণ্ডকায়।।''[১০৩]

জন্মের পূর্বে তার হাত, পা, কাঁধ কিছু ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মমতে আদি দেব বুদ্ধও নিরাকার ছিল। তার অবস্থান ছিল শূন্যে। হঠাৎ সে গোলকের দিকে ধাবমান হল। সেই হতে তার হাত, পা, স্কন্ধ হল। অতঃপর ধর্ম জলের উপর যোগ নিদ্রায় চোদ্দ বছর কাটিয়ে দেয়। ধর্মের জলের উপর অবস্থানের সঙ্গে জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট গবেষক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন — ''বৈদিক দেবতা

পুরুষ কালে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিলে তাঁর পদবী একদিকে বৌদ্ধ দেবতা আদিবুদ্ধ ও অপর দিকে পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা দখল করিয়া জগৎস্রষ্টা হইয়া পড়িলেন।''[১০৪] ধর্ম উলুক নামে পাখির কাছ থেকে তার চোদ্দ বছর ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা জানল। তার কথায় ধর্ম জগতের প্রতি করুণা বর্ষণ করে এবং জগৎ সংসার সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়। 'সৃষ্টি' কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রথমে স্বীয় নাম-মন্ত্র জপ করে। মন্ত্রের দ্বারা সে কমল বা পদ্মফুল সৃষ্টি করে। সেই পদ্মফুলে বসে আদ্যমূল জপ করে পাতালে প্রবেশ করে। মন্ত্র পাঠ ও পদ্মের উপর অধিষ্ঠিত ধর্ম তন্ত্রের মন্ত্র ও আদি বুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর ধর্ম পাতাল থেকে মাটি এনে নখের চাপে তিনভাগ করে কোথায় রাখবে ভাবতে থাকে। সে পরম পবিত্র নখের চাপে মৃত্তিকা সৃজন করে পৃথিবীকে পূর্ণ পবিত্র করে তুলতে চেয়েছিল। সেই পূর্ণ পবিত্র পৃথিবীকে স্থাপনার ব্যাপারে সে চিন্তিত। শেষে নিজেই বরাহ অবতার হয়ে দন্তের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করে। এরপর গজ, কুর্মরূপ ধারণ করে তার উপর পৃথিবী স্থাপনের চেষ্টা করলেও সে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ ধর্ম ধৈয্য রক্ষা করতে না পেরে স্বীয় কনকের পৈতা ছিঁড়ে ফেলে। তাতে সপ্তমস্তকযুক্ত সর্প বাসুকীর সৃষ্টি হয় এবং তাকে সে অমর বর দেয়। তার উপর সে পৃথিবী রক্ষার ভার অর্পণ করে।

ধর্ম পৃথিবী সৃষ্টি করে সেখানে বসবাসের জন্য প্রাণীকুলের প্রয়োজন বোধ করে। তাই ধর্ম এক নারী সৃষ্টি করল — নাম দেবী আদ্যা। আদ্যার জন্ম তাঁর হাই বা হাম্বি থেকে। কারণ হয়তো— (এক) দেবতা বলে মনুষ্য জন্মের প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করেছে। (দুই) প্রচলিত ধারণা যে শ্বাসবায়ুর মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণ সর্বদা যাতায়াত করে। তাই শ্বাসবায়ু প্রাণ স্বরূপ। সেই শ্বাসবায়ু দ্বারা আদ্যাকে সৃষ্টি করে। তবে এখানে দেবতা সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের ধারণার সঙ্গে কবির ধারণা একাত্মতা লাভ করেছে। তবে ধর্মের অলৌকিক জীবন রহস্যের সঙ্গে মানব জীবনের সাদৃশ্য নেই।

''মনতে ভাবিঞা ধর্ম্ম হাম্বি ছারিল।
ধর্ম্মের হাম্বিতে আদ্যা তখনি জন্মিল।।''[১০৫]

সে দেবীর ঊরুতে নখের রেখা দিয়ে তা থেকে সংসারে স্ত্রী- শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়; এরপর গাছপালা, সর্গ-মর্ত্য-পাতালের সৃষ্টি করে। অতঃপর ধর্ম যোগ ধ্যানে থাকে। ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে ধর্মের এক নতুন পরিচয় পাওয়া যায়। সে এক লৌকিক পুরুষ। আদ্যার প্রতি তার কামুক, উচ্ছৃঙ্খল ও লম্পট চরিত্রের প্রকাশ পায়। পুনরায় অঘোর রূপে মোহগ্রস্ত হয়।

''আদ্যারূপ দেখি কাম চেষ্টা হৈল।
আদ্যা দেবীকে ধর্ম্ম ধরিবারে গেল।।''[১০৬]

কামুক ধর্মের কন্যা স্বরূপা নারীর প্রতি মোহগ্রস্ততা অশোভনীয় ও লজ্জাজনক। সেই লজ্জার অনুভূতিটি তার মধ্যে রয়েছে। এই সময় তার রেত পাত হয়। তা থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের

জন্ম হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তপস্যার প্রকৃত পরীক্ষা করার জন্য সে শব দেহরূপে নদী তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে তাদের তপস্যার বলে পিতাকে চিনতে পারেনি। তারা শবদেহের পচা গন্ধে দূরে চলে যায়। তাদের কাছে পিতা যেন জলে ভেসে যাওয়া মৃতদেহ। কিন্তু মহেশ্বরের তপস্যার বলে পিতাকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। শিব কর্তৃক সে নিরামিষ ঘাটে ঊরুস্থলে দাহকৃত হয়। সে দাহকৃত হলেও জগৎ রক্ষার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। তাই সে সৃষ্টিরক্ষা ও পৃথিবী পালনের জন্য শিবকে আদ্যা বিবাহ করার উপদেশ দিল এবং সে শূন্যে ফিরে গেল। অন্যদিকে, ধর্ম নিজ পুত্রকেই শুধু নয়, আদ্যাকেও তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার কর্তব্যপরায়ণ রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবনায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নারদীয় সূক্তের প্রভাব রয়েছে —

''তম আসীত্তমসা গূহ্লমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যাদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্।। ৩।।''[১০৭]

অর্থাৎ, ''সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল (৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন।''[১০৮] বেদে আছে যে, প্রথমে জগৎ জলময় ছিল ও তা অন্ধকার শূন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তার মধ্যে 'এক' উৎপন্ন হলে 'কাম'-এর জন্ম হল। এটাই 'মনস্' সৃষ্টির প্রথম বীজ। মানিক দত্তে ধর্মের স্বরূপে তা লক্ষ্য করা যায়।পুত্রদের তপস্যার প্রকৃতি পরীক্ষা ও আদ্যার রূপে মুগ্ধ হওয়া প্রভৃতিতে ধর্ম মানবিক গুণ সম্পন্ন চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর একটি অপ্রধান পুরুষ চরিত্র হল **নারদ**। চরিত্রটি পৌরাণিক কল্পনা থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্যের মাটিতে এসেছে। পুরাণে নারদের দুটি রূপ — (এক) পরম বৈষ্ণব দেবর্ষি এবং (দুই) তিনি কলহের দেবতা। চরিত্রটি খুব অল্প পরিসরে কাব্যের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে সম্পর্ক স্থাপনে, কলহে, মিলনে ও পরামর্শ দানে বাংলা সাহিত্যে তথা মঙ্গলকাব্যে তার জুড়ি মেলা ভার।

বস্তুত, 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' গ্রন্থের সংকলক সুবলচন্দ্র মিত্র নারদ চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন — ''নার (নর সমূহ) - দা (দেওয়া) + ড কর্তৃ; যিনি জনগণকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন।''[১০৯] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থে বর্ণিত নারদের জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডের ২১-২২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে — ''অনাবৃষ্ট্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।/ নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ।।/ দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।/ জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ/ বীর্য্যেণ নারদস্যৈব বভূব বালকো মুনে।/ মুনীন্দ্রম্য বরেণৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ।।/

কল্পান্তরে ব্রহ্মকণ্ঠাদ্ বভূবুর্ বহবো নরাঃ।/ নারদ্ দদৌ তৎ কণ্ঠঞ্চ তেন তেন্ নারদঃ স্মৃতঃ/ ততো বভূব কালশ্চ নারদাৎ কণ্ঠদেশতঃ/ততো ব্রহ্মা নাম চক্রে নারদশ্চেতি মঙ্গলম্।।/মরীচিমিশ্রৈর্ মুনিভিঃ সার্দ্ধং কণ্ঠাদ্ বভূব সঃ/নারদশ্চেতি বিখ্যাতো মুনীন্দ্রস্ তেন হেতুনা।।"[১১০] অর্থাৎ, "ঐ বালক অনাবৃষ্টির শেষে জন্মলাভ করিবা মাত্র নার (জল) দান করিয়াছিলেন বলে তাঁর নাম নারদ; জাতিস্মর মহাজ্ঞানী বালক অপর বালকদিগকে নার (জ্ঞান) দান করিতেন বলিয়া তাঁর নাম নারদ; নারদ নামক মুনীন্দ্রের ঔরসে জন্ম বলিয়া নাম নারদ; ধর্ম্মের পুত্র নর নামে মুনির বরে এই পুত্র জন্মিয়াছিলেন বলিয়া নাম নারদ; কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বহু নরের উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ বলে, নরদ হইতে জন্ম বলিয়া নাম নারদ।"[১১০]

তবে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারদের কোন জন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ নেই। শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করে তার কাব্যে প্রথম উপস্থিতি। প্রসঙ্গত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "শিব-বিবাহের ঘটক নারদ — ইহা প্রায় সকল পুরাণেই আছে।"[১১১] শিবের পরামর্শে সে সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে আসে। সে শিবের অনুগত। দেবতাগণ গঙ্গার হাতে রান্না খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাই শিব শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাকে একরাতের জন্য শর্ত করে নিয়ে আসে। এইরূপ অবস্থায় বিবাহ সভায় নারদের কুচক্রান্তে গঙ্গার সত্যভঙ্গ হয়। তাই গঙ্গাকে শিব শিরে স্থাপন করতে বাধ্য হল। শিবের এই অসহায়ত্বের পিছনে নারদ অনুঘটকের মত কাজ করেছে।

নারদ শিবের অনুগত হলেও তার আত্মসম্মান ও আত্মাভিমান মাটিতে মিশে যায়নি। শিব অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী নারদকে দিয়ে শ্বশুর হিমালয়-এর গৃহে পৌঁছে দিতে বললে সে —

"ভীমবীরের কন্ধে ভার তুলি দিল।
ভীমকে সঙ্গে করি নারদ চলিল।।"[১১২]

তার চরিত্রটি মধ্যবিত্ত ভাবনা জাত। একদিকে শিবের কথা শুনলেও সে নিজে দ্রব্য সামগ্রীর ভার তুলে নেয়নি। সে ভীমকে দিয়ে তা বহন করিয়েছে। এমনকি তার আঁতে ঘা লাগায় শিবের মান-সম্মান নষ্ট করার পরিকল্পনা করেছে। তার আত্মসম্মানবোধের প্রকাশ ঘটেছে যে ভাষায় তা লক্ষণীয়। সে ভীমকে যাত্রাপথে বলেছে —

"শিবের বাপের নহি চাকর নফর।
সকল দ্রব্য বাস্যা খাবো পথের উপর।।"[১১৩]

অতঃপর সকল খাদ্য খেয়ে তার স্থলে সমুদ্রের কাদা, বালি, জল পূর্ণ করে। তা ভীমের কাঁধে তুলে দেয়। এমনতর কাজ করেও নারদ শিবের শ্বশুর হিমালয়কে গিয়ে আলিঙ্গন করেছে। এদিকে মেনকা অধিবাসের ভারে অখাদ্য দ্রব্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়। সেই মুহূর্তে নারদ সম্মুখ বিপদ এড়ানোর জন্য কৌশলে মিথ্যে কথা বলে —

''নারদ বোলে মেনকাকে কেন কর রোষ।
ভার বান্ধি দিঞাছে শিব মোর নাই দোষ।।''[১১৪]

নারদ মিথ্যা কথায় পারদর্শী চরিত্র। পাশাপাশি নারীদের শ্লীলতাহানিতে তার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। কবির কথায় — ''নারদ নারীগণের বস্ত্র কাড়ি নিল।/ বস্ত্র বিনে নারীগণ লজ্জিত হইল।।''[১১৫] এমনকি, মামা শিবকেও সে শ্লীলতাহানির হাত থেকে রক্ষা করেনি। তার কথায় শিব বিবাহ সভায় উলঙ্গ হয়ে যায়। শিবের মত জ্ঞানী চরিত্রকে সে শিশুসুলভ আচরণ করিয়েছে। নারদ শিবের মনোরথকে পরিচালনা করেছে।

আবার দুর্গার ইন্দ্রপুরে যাত্রাকালে সে সহচরের ভূমিকা পালন করেছে। দুর্গার সঙ্গে অসুরদের প্রবল যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে সে ভয়ে পলায়ণ করে। পথে সে শিবকে দুর্গার বিপদের কথাটি জানিয়ে দেয়। শিব গিয়ে দুর্গাকে বাণ দিয়ে অসুর নিধনের কথা বলে ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে। আবার নারদ শিবের সঙ্গে মর্ত্যভূমিতে যাওয়ার সময় অনাহারক্লিষ্ট পশুদের লক্ষ্য করে। শিবের কাছে সে জানিয়ে দেয় — অভয়া কর্তৃক পশু সৃজন এবং তাদের বসবাস ও খাদ্যের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টির কথা। পশুদের অনাহারে দেখে চিন্তিত শিবকে নারদ সুপরামর্শ দেয়। শিব নারদের কথানুযায়ী বীজ বপন করে বনের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে অভয়ার পরিকল্পনার বিপক্ষে সে শিবকে পরিচালনা করেছে। শিবের পশুদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়কে সে যথা সময়ে কাজে লাগিয়েছে। তার ফলে সে পশুদের নিয়ে দুই বিপরীত ভাবনার জাগরণ ঘটিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে নীলাম্বরের পূজার অধিকার নিয়ে শিব-দুর্গার লড়াইয়ের বীজ বপন করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, 'ইন্দ্রের প্রতি নারদ' অংশটি মানিক দত্তের কাব্যে এসেছে ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরের বিরাট নগরের চন্দ্রমুনির কন্যা ছায়ার সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে। নারদ তার বাহন ঢেঁকি করে বিরাট নগরে চন্দ্রের বাড়ি যায়। চন্দ্রমুনি অত্যন্ত সমাদর আপ্পায়ন সহকারে নারদকে অভ্যর্থনা জানায়। সে বলে — ''রাশি বর্গ বিচারিয়া আইলাম আমি।''[১১৬] সেকালে যে রাশি বর্গ নির্বাচন করে সমাজে বিবাহ সম্পন্ন হত তা নারদের কথায় স্পষ্ট। এ দিকে নারদ ইন্দ্র গৃহে এসে দেখে নীলাম্বর বিবাহ করতে বিরাট নগরে চলে গেছে এবং ইন্দ্রগৃহে বিবাহের বাদ্য বাজনা বাজছে। উপরন্তু শচী গৃহে বসে ধর্ম পূজা করেছে। নারদের অজান্তে সকল কাজ হয়ে গেলে, তাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। শচী তাকে প্রবোধ দিতে পান আনতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন অপমানিত হয়ে নারদ শচীকে জানিয়ে দেয় — ''মস্তক মুড়িয়া পিছে হাতে দেহ পান।।''[১১৭] সে অপমানবোধের প্রতিশোধ স্পৃহা প্রকাশ করেছে বিরাট নগরে বিবাহ সভায় কোন্দলের সূত্রপাতের মাধ্যমে। এই অবস্থায় সে চিন্তিত ইন্দ্রকে বাধ্য করে তার কাছে উপনীত হতে। এবং সকলের সামনে অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্রতার সঙ্গে তার কাছে অসম্মান করার জন্য ইন্দ্র কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নেয়।

এখানে নারদ কেবল প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়, সমকাল, সমাজ ও অন্যান্য চরিত্রের অন্তর রহস্য তার চরিত্রের প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। স্বামী শিবের অজান্তে দুর্গা সুন্দর কাঁচুলি পরিধান করে কালকেতুকে ধন দিতে রওনা হওয়ার সময় পথে নারদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তার মনোমোহিনী রূপ দেখে নারদের উক্তিতে শিব চরিত্রের নিজ প্রবৃত্তির স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে দেবীকে বলে —

"ই হেন মোহন বেশ জদি আছে তোরে।
তবে কেন মামা জায়ে হীরা কোচের ঘরে।।"[১১৮]

তেমনি স্বামীর অলক্ষ্যে দেবী চণ্ডীর মত নারীর বাইরে বেরিয়ে পড়ার গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানানো হয়েছে তার কাছে। এখানে নারদ চরিত্রকে কেন্দ্র করে শিব ও দুর্গার দাম্পত্য জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

আবার দেখা যায় যে, নারদ দেবী চণ্ডীর সংকটে পরামর্শ দাতা চরিত্র রূপে এসেছে। প্রসঙ্গত, দেবী পূজা প্রচারের জন্য কলিঙ্গ ভেঙে গুজরাট রাজ্য স্থাপন করার পরিকল্পনা করলেও প্রজাকুল দিয়ে পূর্ণ হয় না। সেখানে বসতি স্থাপনে একমাত্র বাধা আসে ভাঁড়ুর কাছ থেকে। তাই নারদ ভাঁড়ুকে বিড়ম্বিত করতে দেবীকে মেঘ আনার পরামর্শ দেয়। নারদই এর জন্য দেবীকে ইন্দ্র-সভায় তথা উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যায়। তবে নারদের লক্ষ্য ছিল ভাঁড়ুকে দেবীর দ্বারা লাঞ্ছনা দেওয়া। ভাঁড়ু ব্যতীত অন্যান্য প্রজাদের লাঞ্ছনায় সে মর্মাহত হয়। সে দেবীকে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গ ত ভাবে বলে — "ভাঁড়ুসনে ঐরি বাদ প্রজা মরে কেনি।।"[১১৯] তা সত্ত্বেও দেবী শিব-ভক্ত ভাঁড়ুকে নত করতে পারে না। উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায় চণ্ডী চিন্তায় মগ্ন হয়। এই অবস্থায় নারদ তাকে সান্তালী পর্বতে গঙ্গার কাছে যেতে নির্দেশ দেয়। গঙ্গা চণ্ডীকে সাহায্য করতে নারাজ হয়। তাই ডাক-ডেউরের দ্বারা চণ্ডী ভাঁড়ুকে যারপর নাই শাস্তি দেয়। এখানে চণ্ডী তার উদ্দেশ্যের কথা ভুলে ভাঁড়ুকেই বিড়ম্বনায় ফেলা ও তার প্রচণ্ডতা প্রকাশে ব্যস্ত। নারদ দেবীকে ব্রত প্রচারের জন্য ভাঁড়ুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সচেতন নারদ অপ্রকৃতিস্থ দেবীর চেতনা ফেরাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কবি মানিক দত্ত তাকে শুধু কোন্দল সৃষ্টিকারী, সম্বন্ধ স্থাপনকারী, পরামর্শদাতা রূপে অঙ্কন করেন নি, তিনি চরিত্রটিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় উপস্থাপন করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ খণ্ডের সমাপ্তি এবং ধনপতি খণ্ডের কাহিনী ধারা বিবর্তনের যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে নারদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কালকেতু উপাখ্যানে চারদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করে দেবী চণ্ডী চিন্তিত হয় এবং ধনপতি খণ্ডের কাহিনী ধারার বিবর্তনের পথ তার দ্বারা উন্মোচন হয়। এই খণ্ডে শিব শিষ্য কর্ণমুনিকে ছলনার জন্য দেবী ও নারদ পরামর্শ করে। নারদ চণ্ডীকে পাশা খেলায় ছলনার

দ্বারা কর্ণমুনিকে মর্ত্যে নামাবার পরিকল্পনার কথা বলে।

এই ভাবে মানিক দত্ত নারদ চরিত্রকে তাঁর কাব্যে ব্যাধ খণ্ডে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ধনপতি খণ্ডের শুরু করে তবেই তার ভূমিকা লোপ পেয়েছে। এরপর সেই ভূমিকা পালন করে চণ্ডীর সখী পদ্মা। তবু এই অল্প পরিসরেই কবি পুরাণ পরিচিত নারদকে সম্বন্ধ-স্থাপনকারী, কলহকারী, আবার পরামর্শদাতা রূপে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — "... ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। বিষ্ণু আর্য আর মহেশ্বর অনার্য দেবতা। তাই বিষ্ণুভক্ত নারদ সর্বদা শক্তি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে মিল।"[১২০] কবি কাব্যের প্রয়োজনে নারদ চরিত্রটিকে সমাজ চিত্র উন্মোচনে, প্রধান চরিত্রের মনোরথ পরিবর্তনে, কাহিনী ত্বরান্বিত করতে ও যোগসূত্র স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা হিসাবে পালন করিয়েছেন। লক্ষণীয়, বিষ্ণুভক্ত নারদ চরিত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিবের প্রতিপক্ষ রূপে কাজ করেছে। নারদের দ্বারা কবি বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্মের বিরোধ প্রকাশ করেছেন। এই দিক থেকে নারদ চরিত্রকে স্থির বা Type চরিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে যাত্রা পথে, নীলাম্বরের বিবাহ সভায় তার আত্মসম্মানবোধ ও বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গের পরিকল্পনায়, কলিঙ্গ প্রজাদের প্রতি হৃদয় বিগলিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে বৈপরীত্য চরিত্রের উদ্‌ভাস তাকে Type চরিত্র থেকে Individual চরিত্রে সমুন্নত করেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর একটি দেবখণ্ডের অপ্রধান দেবতা চরিত্র **উলুক**। সে এক প্রকার সাদা পেঁচা। মহাভারতে তার উল্লেখ রয়েছে। যেখানে সে শকুনির পুত্র এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু, এখানে ধর্ম কর্তৃক দৃষ্ট প্রথম জীব। তার কাছ থেকে ধর্ম তার দীর্ঘ চোদ্দ বছর ব্যাপি ধ্যান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। তার অনুরোধে ধর্মের জগৎ-সংসার সৃষ্টির ভাবনা জাগ্রত হয়। এখানে জগৎ-সংসার সৃষ্টির তত্ত্বসারৎসারী হিসাবে তার ভূমিকা অকৃত্রিম।

ধর্ম জগৎ সৃষ্টির পর তার রক্ষার জন্য **বাসুকি** অবতার হয়। বাসুকি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রামায়ণে সমুদ্রমন্থণ হয় তাকে কেন্দ্র করে এবং মহাভারতে তার পরিচয় নাগরাজ হিসাবে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তার পরিচয় নাগরাজ রূপেই। ধর্মের কনকের পৈতা থেকে তার জন্ম। এখানে তার সাত মাথা রয়েছে এবং তার উপরই পৃথিবীর ভার অর্পণ করা হয়। ধর্মের অপর একটি অবতার হল **বরাহ**। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে সে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। ধর্মের পুত্র **ব্রহ্মা** ও **বিষ্ণু**। তারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের ভণ্ড তপস্বী। পিতার শব-দেহ তারা চিহ্নিত করতে পারে না। বরং তার গন্ধে দূরে সরে যায়। পিতা ধর্ম তাদের জগৎ-সংসার রক্ষার ভার এবং আদ্যাকে গ্রহণ করতে বললেও তারা পিত্রাদেশ অমান্য করে। উভয়ে আদ্যাকে মাতৃ-জ্ঞান করে কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ায়। অতঃপর আদ্যাকে বিবাহ করে শিব। আদ্যার সপ্তজন্মের প্রসঙ্গে **ভৃগু**

মুনি, দক্ষ, হরি, হিমালয় প্রভৃতির নাম আসে। এরা সকলেই পুরাণ পরিচিত চরিত্র। তবে এখানে এরা সকলে আদ্যার পিতৃ পরিচয়ে ভাস্বর। প্রসঙ্গত, হিমালয় সন্তানহীন। হিমালয়ের তপস্যার ফল স্বরূপ আদ্যাকে কন্যা রূপে পায়। নাম রাখা হয় গৌরী। শৈশবে গৌরীকে সে শিব আরাধনার মন্ত্রণা দেয়। এবং বাল্য বয়সে পিতা হিমালয় কন্যাকে অতি বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে বিবাহ ঠিক করে। বৃদ্ধ পাত্রের হাতে কন্যাকে সম্পাদন করাতে তার কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সম্ভবত, প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের কৌলিন্য প্রথায় বিশ্বাসী সে।

আবার দেব সমাজে পুরাণ পরিচিত অপর একটি পুরুষ চরিত্র **শান্তনু**। মহাভারতের আদি খণ্ডে শান্তনুর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র এবং মহাবীর ভীষ্মের পিতা। আম তার স্ত্রী গঙ্গা। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মহাভারতের এই চরিত্রটির আগমন ঘটেছে দেব সমাজের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেটি হল শিবের বিবাহে রন্ধন কার্যের জন্য শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাকে প্রয়োজন হয়। কারণ গঙ্গা রন্ধন না করলে শিব গৃহে দেবসমাজের কেউ অন্নগ্রহণ করবে না। তাই শিব শান্তনু মুনির কাছ থেকে তার স্ত্রী গঙ্গাকে শর্ত করে নিয়ে যায়। শর্ত হল — সেই রাতেই গঙ্গাকে গৃহে ফিরিয়ে দিতে হবে। স্ত্রী গঙ্গার কোন সেক্ষেত্রে মতামত নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ শান্তনু মুনি। তার শর্ত ভঙ্গ করলে গঙ্গাকে সে পরিত্যাগ করে। পরগৃহে গঙ্গা রাত্রি যাপন করায় শান্তনু আর তাকে গ্রহণ করেনি। তাদের দাম্পত্য জীবনে সত্যাসত্য অনুসন্ধান ও সহৃদয়তার তুলনায় মধ্যযুগের নারীর অন্যত্র রাত্রি যাপনই বড় হয়েছে পুরুষ প্রধান সমাজে।

শিবের বিবাহকে অবলম্বন করে **ভীম** চরিত্রটির উল্লেখ। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তার পূর্ব পরিচয় নেই। তার একমাত্র পরিচয় সে বীর নারদের সহায়ক। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবায়ন কাব্যের ভীম চরিত্রের যে অবদানের কথা বলেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য — ''ভীম নাম মহাভারত হইতেই আসিয়াছে। সাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী রূপে কৃষক শিবের কৃষিকার্যের সহায়করূপে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে।''[১২১] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের বিবাহের সময় শ্বশুর বাড়ির জন্য প্রেরিত দ্রব্য সামগ্রী নারদ তাকে দিয়ে বহন করিয়েছে। তার পরিচয় সে বলশালী ও বাহক। তারা শিবের প্রেরিত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে তার স্থানে কাদা, জল ও বালিতে পূর্ণ করে। তার এই কীর্তিতে হাস্যরসের উদ্রেক হয়েছে। দেবখণ্ড ছাড়াও তার চরিত্রের উল্লেখ ধনপতি খণ্ডেও রয়েছে। সেখানে সে দেবী চণ্ডীর সারথী। এখানে তার পুরাণ বহির্ভূত স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌরীর দুই পুত্র **গণেশ, কার্তিক** এবং **শনি** চরিত্র উল্লেখযোগ্য। গণেশ গৌরীর উদরস্থ সন্তান নয়। পুরাণ কথিত গৌরীর গাত্র মল থেকে গণেশের জন্ম রহস্য

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণ করেছেন। এখানে গৌরী তার গাত্র মল দিয়ে গণেশ স্বরূপ পুতুল তৈরী করে এবং পিতা শিব তাতে প্রাণ দান করে। গৌরীর মাতৃসত্তার জাগরণ ও গণেশ সৃষ্টির মিথ এখানে স্বকীয়। গণেশের আশ্চর্য জন্ম দেখতে অন্যান্য দেবতার মত শনিও আসে। তার দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডুচ্ছেদ হয়। প্রসঙ্গত, বণিক খণ্ডে শনি চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে রাজা শ্রীবৎসকে ছলনা করে। তার একাদশীর ব্রত শনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভঙ্গ করে। এমনকি, নৌকার বাহক ছদ্মবেশে রাজার সমস্ত ধন হরণ করে। তখন রাজা বাধ্য হয় তার প্রিয় শারী-শুয়া পাখিদ্বয়কে ছেড়ে দিতে। সে যাই হোক, ইন্দ্রের হস্তীর মুণ্ডুচ্ছেদন করে গণেশের মাথায় স্থাপন করা হয়। তাতে সে পুনর্জীবিত হয়। তার মুসিক বাহনের কথাও এখানে উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর কার্তিকের জন্ম। কার্তিক পিতা শিবের বীর্য থেকে জন্ম লাভ করে। তবে মাতৃগর্ভ থেকে হয়নি। সে শৈশবে চন্দ্রের ছয় নারী দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তার অপর নাম ষড়ানন এবং তার ময়ূর বাহন রয়েছে। পিতার ভিক্ষাজাত খাদ্য দ্রব্যের জন্য অধীর অপেক্ষা এবং তা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া আমাদের হতদরিদ্র গার্হস্থ্য জীবন-চিত্রের মুখোমুখি করে দেয়।

দেব চরিত্রের সঙ্গে অসুর চরিত্রগুলি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উপেক্ষা করার নয়। চণ্ডীর সঙ্গে অসুরদের লড়াই এবং পুরাণ প্রসঙ্গ উত্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত, ঋগ্‌বেদের যুগে ভয়ের দেবতাকে অসুর ও ভক্তির দেবতাকে বলা হত দেব। তাই ভয়ের দেবতা বরুণ 'অসুর' এবং ভক্তির দেবতা বিষ্ণু 'দেব'। 'অসুর' শব্দটি কালক্রমে হীনার্থক হয়ে দেব-বিরোধী অর্থে বোঝাতে লাগল। যেসব অসুরদের কথা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তারা হল **মধুকৈটভ**, **মহিষাসুর**, **মহাবীজ**, **রক্তবীজ**, **মহীধর**, **শুম্ভ**, **নিশুম্ভ** , **ধূম্রলোচন** প্রভৃতি। এরা অধিকাংশই মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর বহু পরিচিত চরিত্র। মধুকৈটভ চরিত্রটির জন্ম বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে। তার থেকে প্রচুর এবং প্রচণ্ড অসুরের সৃষ্টি হয়। তাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকুণ্ডে আত্মগোপন করে। তারা বিষ্ণুর সঙ্গে সহস্র বছর যুদ্ধ করে। যুদ্ধে যত অসুর মরে, তাদের রক্তে ততধিক অসুর পুনরায় জন্ম হয়। এই বিপদ শঙ্কুল অবস্থায় দেবগণ ভীত। অতঃপর দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে মহাবীজ ও রক্তবীজ নামে দুই ভাইয়ের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তারা মৃত্যু বরণ করে। তা দেখে মহীধর নামে এক অসুর ক্রোধিত হয়। তার মৃত্যুর পর শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের রণাঙ্গণে আগমন ঘটে। তারা অত্যন্ত পরাক্রম যোদ্ধা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে চণ্ডী ঘেমে যায়। সেই ঘর্মনিষিক্ত জল থেকে কালীর জন্ম হয়। কালী কর্তৃক তারা দুই ভাই নিহত হয়। আবার ধূম্রলোচন নামক অসুরের ভয়ে ভীত দেবতারা, সে মর্ত্যপুরের অধিবাসী। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের একমাত্র বাধা স্বরূপ সে। তার ত্রাসে মুনিরা মর্ত্যে অতিষ্ঠ। এই অত্যাচারী ধূম্রাসুরকে দেবী চণ্ডী নিহত করে এবং মর্ত্যে তার পূজা প্রচারের পথ সুগম করে। দক্ষিণ পাটনের

সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যুদ্ধে অনেক দৈত্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তারা সকলেই দেবীর পক্ষে যুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **মঙ্গলা, জলেশ্বর, ধণ্ডা, তালজঙ্গ, হিঙ্গ, ভিঙ্গপাল, মহা, কালবাণ** প্রভৃতি। মঙ্গলা জমের পুত্র। তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে — ''আল্য জমের পুত্র মঙ্গলা জমকাল।''[১২২] তার দাঁতগুলি বৃহদাকার ও ভয়ঙ্কর। জলেশ্বর এতটা শক্তিশালী যে, রণক্ষেত্রে একলক্ষ কোতাল সম্মুখে সে একাই লড়াই করতে পারে। ধণ্ডা নামক মহাদানা দাঁত দিয়ে লোহার মুদ্‌গর চূর্ণ করতে সক্ষম। তালজঙ্গ বারমাস সর্বক্ষণ যুদ্ধ করতে সক্ষম। তার সঙ্গে প্রথম দক্ষিণ পাটনের সেনা রামানন্দের যুদ্ধ হয়। কালবাণ দৈত্যদের রাজা। একলক্ষ হাতি তার প্রাতঃ ভোজনের সামগ্রী। এমনকি, সে হাতি, ঘোড়া রথারথি সহ সব গ্রাস করতে সক্ষম। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দৈত্যদের এখানে চণ্ডীর ক্ষমতার প্রকাশে এবং রণক্ষেত্রের ভয়াবহতা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ হয়।

মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য দোহরা নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সূত্রে **বিশ্বকর্মা, ভীম** ও **অর্জুন** প্রভৃতি চরিত্রের প্রসঙ্গ আসে। এরা সকলে মহাভারতের খ্যাতনামা চরিত্র এবং বীর যোদ্ধা। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাদের পরিচয় ভিন্ন। সেখানে তারা নিম্নশ্রেণীর ছুতোর। চণ্ডীর অনুরোধে তারা কলিঙ্গে দোহরা নির্মান করতে উপস্থিত হয়। সেক্ষেত্রে বলশালী **হনুমান**-এর আগমন। মঙ্গলকাব্যে হনুমান চরিত্রের সম্বন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''হনুমান নাম রামায়ণ হইতেই মঙ্গলকাব্যে আসিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের উপর ইহা রামায়ণের ব্যাপক প্রভাবেরই পরিচায়ক। অসম্ভব বীরত্ব এবং সাহসিকতাপূর্ণ কাজ মাত্রই হনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সূত্রে হনুমান কখনও মনসার, কখনও ধর্মঠাকুরের, কখনও চণ্ডীর দুঃসাধ্য কার্যের সহায়ক।''[১২৩] সে পবন নন্দন এবং সে ধ্যানী। দেবীর স্মরণে তার ধ্যান ভঙ্গ হয়। তার প্রকাণ্ড দেহ এবং বলশালীর ভারে বসুমতী কম্পিত। তবে সে বিশ্বকর্মার সহায়ক কর্মী। এছাড়া ভীম ও অর্জুনও মজুর হিসাবে কাজ করেছে। দোহরা নির্মাণে তারা কাঠ কাটতে আসে। বৃত্তিতে তারা সমাজে নিম্নশ্রেণীর পরিচয় বহন করে। কবির কথায় —

''ভীম অর্জ্জুন আমি করাতে দিল টান।
বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া করে দেহরা নির্ম্মান।।''[১২৪]

এমনকি, ধনপতি খণ্ডে শ্রীমন্তের ডিঙ্গা তৈরীর জন্যও দেবী চণ্ডী বিশ্বকর্মা, হনুমানের আগমন ঘটে। মঙ্গলকাব্যে বিশ্বকর্মা চরিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নাম পুরাণ হইতে আসিয়াছে, তবে পৌরাণিক কোন ক্রিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যে সম্পন্ন করেন নাই। তিনি প্রধানতঃ কাঁচুলি নির্মাণ করিয়াছে, নৌকা গঠন করিয়াছে, কিংবা পার্থিব জীবনের ব্যাবহারের জন্য আরও অনুরূপ দুই একটি কাজ করিয়াছেন

মাত্র।''[১২৫] এখানে তারা দেব মায়ার বলে 'কামিলা' বা দিনমজুরের ছদ্মবেশ ধারণ করে। পরিচয় তাদের ব্যক্তিতে নয়, বৃত্তিতে। নিম্নশ্রেণীর ছুতোরের কর্মে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, শ্রীমন্ত তাদের প্রথম জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাদের কাছে কোন অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি না দেখলে তারা বলে —

''মিথ্যা না কহিব শুন সাধুর নন্দন।
অস্ত্র বান্ধা দিঞা কৈলাঙ উদর পালন।।''[১২৬]

গাছ কেটে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান করে অত্যন্ত কৌশলে সপ্তডিঙ্গা নির্মাণ করে। সেগুলি হল মধুকর, যাত্রামঙ্গল, সাধু মধু, রত্ন, চন্দনের পাট ইত্যাদি। এধরনের সদাগরী নৌকা তারা তৈরী করে।

অন্যদিকে, **ইন্দ্র** চরিত্রটির পরিচয় উচ্চবর্ণের আলোকে। ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা সে। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে সে পুরাণ পরিচিত দেবরাজ। স্ত্রী শচী ও পুত্র জয়ন্ত। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার স্ত্রী শচী হলেও পুত্রের নাম নীলাম্বর। এমনকি, এখানে তাকে দেবরাজ রূপে পাইনা। দেবী চণ্ডী তার সমস্ত সমস্যায় তার দ্বারস্থ হয়েছে। সে দেবী চণ্ডীর পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পঞ্চ দাসী এবং মর্ত্যে পূজা প্রচারের উপায় সম্বন্ধে লিখিত পুথির সন্ধান দিয়েছে। এমনকি, ভাঁড়ু দত্তকে হেনস্থা করতে প্রথম ঝড় বৃষ্টির জন্য দেবী চণ্ডী তার কাছে উপস্থিত হয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — 'ইন্দ্রও দেবরাজ রূপে মঙ্গলকাব্যে স্থান পান নাই। তিনি কেবলমাত্র ঝড় বৃষ্টির কারক রূপেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখনই ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ উৎপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।''[১২৭] সেই দিক থেকে ইন্দ্রের সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে শৈব। তার শৈব ভক্তির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে তার ধ্যানে ইন্দ্র মগ্ন ও ধ্যানস্থ। চণ্ডী ইন্দ্রের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে অবগত করতে চাইলে সে প্রথমত তার পরিকল্পনায় সাড়া দেয়নি। ইন্দ্র তাকে শিব ভক্তির নিষ্ঠা প্রকাশ করে। সে দেবীকে বলে —

''শিবের আশীর্ব্বাদে ইন্দ্র পদ মোর
পুত্র হবে কোনমন কথা।।''[১২৮]

সে শিবের অনুগত। অন্যদিকে, সে নিঃসন্তান। দাম্পত্য জীবনে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। এই অবস্থায় চণ্ডী তাকে পুত্রবর প্রদান করতে চাইলে তার মন টলে। তবে ইন্দ্র সমাজে দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পরখ করে নিয়েছে। তার প্রতি প্রত্যয় জন্মাবার পর তাকে পুত্রবর দান করা হয়। তার স্ত্রী শচীর গর্ভে নীলাম্বরের জন্ম হয়। অতঃপর তার মধ্যে পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়। সে পুত্রের বিবাহের জন্য সমসামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন বিরাট নগরের চন্দ্রের কন্যার কথা উত্থাপন

করে। লক্ষণীয় স্বর্গের দেবতার মর্ত্যের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন স্বর্গ-মর্ত্যের যোগসূত্র স্থাপন বলে মনে হয়। পুত্রের বিবাহে নারদকে আপ্যায়ণে অবহেলা করলে বিবাহ সভায় কোন্দল বাঁধিয়ে দেয়। এই সমস্যা শঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হয় পিতা ইন্দ্র। সে সকলের সামনে নারদের কাছে স্বভাব সুলভ বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ইন্দ্র তাকে বলে —

''আর যদি কোন কর্ম্ম করি ইন্দ্রপুরে।
সভার আগে নিমন্ত্রণ দিমু তোমার তরে।।''[১২৯]

এই কথায় তার বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী বক্তা হিসাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তার বলার কৌশলে নারদ অত্যন্ত লজ্জিত হয়। বন্যা দ্বারা পর্যুদুস্থ করলে ভাঁড়ু দত্ত শিব ভক্ত ইন্দ্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। তাতেও সে লজ্জিত হয় এবং সমস্ত মেঘ ও বাতাসকে নিয়ে ফিরে যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে **চন্দ্র** ইন্দ্রের সম্পর্কে বিয়াই। বিষ্ণুপুরাণ কালিকাপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে গুরু-পত্নী তারার সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্কের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে তার কোন সন্তানের উল্লেখ নেই। কিন্তু গুরু-পত্নী তারার গর্ভে তার পুত্রসন্তান বুধকে সে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করে। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার কন্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। তার নাম ছায়াবতী। তার কন্যার সঙ্গে নীলাম্বরের বিবাহ স্থির হয়। সেই বিবাহ ঠিক করে নারদ। নারদ মুনির আগমণে চন্দ্র মুনির আতিথেয়তা অত্যন্ত সম্মানজনক। সে নারদকে পা ধোওয়ার জন্য জল প্রদান করে। এমনকি, নারদের বিশ্বস্ততায় সে কন্যার বিবাহ নীলাম্বরের সঙ্গে দিতে সম্মতি জানায়। বিবাহে বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে দু'জন দাসী যৌতুক স্বরূপ দান করা হয়। উচ্চবর্ণের মানুষরা কন্যার বিবাহে তার সুখ শান্তি লক্ষ্য করে এইরূপ যৌতুক প্রদান করত। কবির ভাষায় —

''দানে জোতুকে তুশীল দুইজন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গীয়া দিল রজত কাঞ্চন।।
মুক্তা প্রবাল দিল বহুমূল্য ধন।
বিভা করিয়া আইলা আপন ভুবন।।''[১৩০]

উচ্চবর্ণের বিবাহরীতি ও কর্তব্যপরায়ণ পিতা চন্দ্রের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

চণ্ডীর 'কালকেতু ছলনা' অংশটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেক্ষেত্রে **চিত্রগোবিন্দ**-এর নাম পাওয়া যায়। পুরাণে এই নামে কোন ব্যক্তির উল্লেখ নেই। সেখানে চিত্রলেখা নামে একজনের নাম পাওয়া যায়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী তাকে কাঁচুলি নির্মাণের জন্য স্মরণ করে। পুরাণে চিত্রলেখা চরিত্রের মত তারও একই পরিচয় রয়েছে। সে চণ্ডীর কালকেতুকে ছলনার জন্য চারপ্রকার বিচিত্র কাঁচুলি নির্মাণ করে। সেই কাঁচুলি অলৌকিক গুণসম্পন্ন।

দেবতাযোগে দেব-কাঁচুলি, পুষ্প সহযোগে পুষ্প-কাঁচুলি, মৎস্য সহযোগে মৎস-কাঁচুলি এবং পক্ষ সহযোগে পক্ষ-কাঁচুলি তৈরি করে। এই কার্যে তার পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবনার পরিচয় রয়েছে। পুরাণ প্রসঙ্গে **ব্রহ্মা, পঞ্চানন, গরুড়, নারায়ণ, ত্রিলোচন, ভগবতী, গণপতি, কার্তিক, জলধর, পুরন্দর, শমন, পবন, গঙ্গা, কালিকা গোসানী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, নারদমুনি, ষষ্ঠী দেবী, আকাশ কামিনী, পাতাল নাগিনী** প্রভৃতি দেবতা ছাড়াও মহাভারতের **বাসুদেব, ভীম, অর্জুন, মহাদেব, চন্দ্র** ও **সূর্য** প্রভৃতির নাম এসেছে। এরা চিত্রগোবিন্দের নির্মিত কাঁচুলির চিত্রলেখার নাম তালিকা মাত্র। এক্ষেত্রে তারা ঘটনা ও কাহিনী পরিবর্তনে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নি।

তবে, ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর দ্বন্দ্বে যেসকল চরিত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে তারা ঘটনা ও কাহিনীতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। মূলতঃ তারা এসেছে ভাঁড়ু দত্তকে শায়েস্তা করতে। পরিচয়ে তারা ইন্দ্রের সভাগত বিভিন্ন মেঘ। তাদের নাম হল **হুরুকা, দুরুকা, আবর্ত, সামর্ত, পুষ্করা, কালাপাহাড়, আন্ধারিয়া** ও **সিন্ধুরিয়া** প্রভৃতি। এদের মধ্যে পুরাণ পরিচিত পুষ্করা। সে বরুণের পুত্র মেঘ। আর কালাপাহাড় ইতিহাসের অত্যাচারী, প্রথানাশক কিংবদন্তি চরিত্র। কিন্তু এখানে সকলেই ইন্দ্রের রাজসভায় পালিত প্রজা ও দেবী চণ্ডী তাদের মুখাপেক্ষী। তারা দেবী চণ্ডীর কাছে নিজেদের অসম্ভব ক্ষমতার ও অলৌকিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু চণ্ডীর কাছে তারা সহানুভূতি অর্জন করতে চেয়েছে। 'নাল মাহিনা' অর্থাৎ বেতনের পরিবর্তে চাষের জমি ভোগ করে তারা। কবি তাদের আত্মপ্রচারের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন —

''মেঘের কথা শুনিয়া ভবানীর হৈল হাস।
অন্ধকার পৃথিবী জেন চন্দ্রের প্রকাশ।।
দুর্গা বলে এত মেঘ নাল মাহিনা খাও।
সকল মেঘ বিদায় দিয়া তোমরা দুই ভাই জাও।।''[১৩১]

শেষপর্যন্ত, দেবী এদের ব্যতীত পবনদেবতাকে নিয়ে যায়। সেও ভাঁড়ু দত্তের দৃঢ় মনোবলকে টলাতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ মনের হয়ে চণ্ডী গঙ্গার কাছে গেলেও তাকে বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রের কথায় গঙ্গার দুই পুত্রের কাছে দেবী উপস্থিত হল। সে দুই পুত্র হল **ডাক** ও **ডেউর**। মহাভারতে ভীষ্ম ছাড়া গঙ্গার এনামে কোন পুত্র নেই। গঙ্গার এই পুত্র সান্তালী পর্বতে বাস করে। সাধারণ লোকালয় থেকে তাদের অবস্থান বহুদূরে পাহাড়-পর্বতে। অন্তপুরে তাদের কাছে চণ্ডীর আগমন বার্তা চাকর মারফৎ পৌঁছায়। তাতে তারা খুব আনন্দিত হয় এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গলায় বসন দিয়ে অতিথি বরণ করে। কবির ভাষায় —

''একজন পূরে জাইয়া বাত্রা জানাইল।
নারদ সহিতে দ্বারে ভবানী আইল।।

ভবানীর নাম শুনি আনন্দিত মন।
শীঘ্রগতি দুই ভাই দিল দরশন।।
গলাতে বসন বান্ধে করে নিবেদন।
কুন কম্মে হৈল মাতা তোমার আগমন।।''[১৩২]

তারা দেবীর সমস্যার কথা শুনে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। লক্ষ লক্ষ বন্যাকে ডেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডাক-ডেউর রাজশঙ্খ ও জয় ঘন্টা বাজিয়ে আঠারো প্রকারের বন্যাকে একত্রিত করে।

''রাজশঙ্খ জএ ঘন্টা তাড়াতড়ি দিল।
আঠার জোয়ারের বন্যা একত্র হৈল।।''[১৩৩]

এখানে ডাক-ডেউর সামাজিক পরিচয়ে অন্ত্যজ; কিন্তু তাদের সমাজে তারা রাজপরিবারের অধিকর্তা। দেবী চণ্ডী সেই নিম্নশ্রেণীর কাছেই দ্বারস্থ হয়েছে। যুদ্ধে আগত আঠারো প্রকারের বন্যা আঠারো প্রকারের সৈন্য দল বলে মনে হয়। ডাক-ডেউর ও চণ্ডী সহ ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে লড়াই, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই বলে মনে করলে অত্যুক্তি হয় না। ভাঁড়ুদত্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত শিব-ভক্ত ও উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই ভাঁড়ুর সঙ্গে ডাক-ডেউরের লড়াই উচ্চবর্ণের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর লড়াই বলে বোধ হয়।

আবার কখনও উচ্চ পদাধিকারী দেব সমাজের কাছে নিম্ন পদাধিকারী দেবতারাও নিপীড়িত হয়েছে। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রের রাজসভায় নর্তকী রত্নমালা অভিশপ্ত হয়েছে মর্ত্যে মানবজন্মের জন্য। সেই স্বজন-হারা বেদনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে **মালাধর** ও **জয়ধর** চরিত্র দুটি। মালাধর রত্নমালার পুত্র জয়ধর তার স্বামী। মালাধর মাতৃবিয়োগে অধীর। তার দুই স্ত্রী — উলুবা ও দুলুবা। মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহুবিবাহের অনুগামী মালাধর। তারা সকলেই ইন্দ্রের সভায় নর্তক। নৃত্যের তালভঙ্গ জনিত কারণে মালাধরের মাতা রত্নমালার ভয়াবহ বিপদ। সেই বিপদ হল মর্ত্যে মানব জন্ম গ্রহণ করা। তার ফলে মাতৃবিচ্ছেদের বেদনায় পুত্র মালাধর মাটিতে পড়ে ব্যাকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে।

''কান্দে মালাধর ধুলায় ধূসর
ধরিয়া জননীর চরণ।
মুণ্ডে দিয়া দুই হাত বুকে জেন বজ্রাঘাত
হেট মাথে করিছে রোদন।''[১৩৪]

মাতার এই পরিণতির জন্য তার প্রতিবাদের ভাষা নেই। বিধির উপর দোষারোপ ছাড়া তার কোন উপায় নেই। এরূপ অবস্থায় পরিবারের সকলের ক্রন্দন লক্ষ্য করে সর্বশেষে গৃহকর্তা জয়ধর

সেখানে উপস্থিত হয়। সে সমাজ অভিজ্ঞ ও প্রকৃত গৃহকর্তা। সকলের মত সে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়েনি। কীভাবে এই বিপদ থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করা যায় তার উপায় খোঁজে। তাই সে ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয় এবং বহুবার অত্যন্ত করুণার সঙ্গে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। এভাবে উচ্চশ্রেণীর রাজাদের দ্বারা মালাধরের পরিবারের মতো সামান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষরা প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হত। তাদের ন্যায় বিচারের জন্য প্রতিবাদের কোন স্থান ছিল না। সেই অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর প্রজা তারা।

এরূপ অবস্থার শিকার ধনপতি খণ্ডের **পুষ্পদত্ত** ও **বিদ্যামন্ত** নামে দুই দেবচরিত্র। তারা দু'জনেই ইন্দ্রের রাজসভার নর্তক। মাতুলি নামক আজ্ঞাপ্রেরকের কথায় পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্ত ইন্দ্রের সভায় নাচতে আসে। নাচে সঙ্গে তারা মধুরকণ্ঠে রামগুণগান করে। তা শুনে ইন্দ্রের স্ত্রী শচী মগ্ন চিত্তে স্বামী ইন্দ্রের বুকে হাত দেয়। তা দেখে পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্তের হাসির উদ্রেক ঘটে। এই সামান্য ভুলে ইন্দ্র তাদের দুই জনকে চরম অভিশাপ দেয়। সেই অভিশাপে তারা শারী ও শুক নামক পাখিতে পরিণত হয়। প্রথমে মর্ত্যে তারা রাজা শ্রীবৎসের দরবারে পালিত হয়। সেখানে ব্যাধ কর্তৃক বন্দী হয় এবং উজানীর রাজা বিক্রমকেশরের কাছে এসে উপস্থিত হয়। রাজদরবারে তারা বিভিন্ন প্রহেলিকার দ্বারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় এবং রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে রাজসভায় শারী ও শুকের ভিন্ন পরিচয় প্রদান কৌতূহল জাগ্রত করে। ইন্দ্রের সভায় নর্তক পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এবং গুরুগৃহে তারা শিক্ষা লাভ করত। তাদের দোষে গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে পক্ষিতে পরিণত হয়। তাই তারা বলে —

> ''ব্রহ্ম বংশেতে জন্ম শুন বিবরণ।
> পূর্ব্বজন্মে দুই ভাই আছিলাঙ ব্রাহ্মণ।।
> নিত্য শিখিতাঙ বিদ্যা গুরু বিদ্যমান।
> দুরজোগে গুরুক আসি করিলাঙ লঙ্ঘন।।
> দোষ দেখি দুই ভাইকে গুরু শাপ দিল।
> গুরুর শাপতে পক্ষ কুলে জন্ম হৈল।।''[১৩৫]

সমাজে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সম। তাদের হত্যা করা ব্রহ্ম হত্যার সমান। তারা সমাজে ক্ষমতায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে ছিল। তার উজ্জ্বল চিত্র শারী ও শুকের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

পুরুষ অপ্রধান চরিত্রের মত **পদ্মা** নারী অপ্রধান চরিত্র হিসাবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসেছে। সে চণ্ডীর সহচরী ও পরামর্শ দাত্রী অপ্রধান নারী চরিত্র। তার অপর নাম বাহুড়ী। কাহিনী ধারায় তার আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ক্ষণে। পদ্মা এখানে শুধু চণ্ডীর সহচরী ও পরামর্শ দাত্রী, সমস্যা সমাধানকারী চরিত্র হিসেবে নয়, কাহিনীর

যোগ সূত্রকারী, চরিত্রের মনকে নিয়ন্ত্রণে এবং সঞ্চালিকা চরিত্র হিসেবে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সহচরীপদ্মা চণ্ডীর পূজা প্রচারের ব্যাপারে সমস্ত প্রকার সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছে। দুর্গা পদ্মাকে কাছে জানায় যে, মর্ত্যে সকল দেবতার পূজা হলেও তার পূজা হয় না কেন? পদ্মা তার পূজা প্রচারের একমাত্র উপায় স্বরূপ অসুর ধূম্রলোচন বধের কথা উত্থাপন করে। সে দেবীর পূজা প্রচারের মন্ত্রণা শক্তি। তার পরামর্শে মর্ত্যে চণ্ডী বহুল পূজা প্রচারের জন্য ফুলফুল্যানগরের কানা খোঁড়া মানিক দত্তের কাছে উপনীত হয়। চণ্ডী এই উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের কাছ থেকে পুথি আনে এবং মানিক দত্তকে মর্ত্যে গীত প্রচারের আদেশ দেয়। এমনকি চণ্ডীর যে-কোন সমস্যায় পদ্মা তাকে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথে চালনা করেছে।

প্রসঙ্গত, পদ্মাই দেবীকে মর্ত্যে পশু সৃজন করতে বলে। পশুকুল কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তাই দেবী তাকে ধন দেবার জন্য গোধিকারূপ ধারণ করে। ব্যাধ কালকেতু দেবীকে বন্দী করে। বন্দী দেবী অসহায়। স্বামী শিবের অজ্ঞাতে দেবীর অন্য পুরুষের কাছে বন্ধন জানতে পারলে তাকে গৃহে তোলা হবে না — এই ভয়ে দেবী ভীত সন্ত্রস্ত আসন্ন বিপদে দেবী চণ্ডীকে পদ্মা প্রবোধ দিতে কালকেতুর ভবিষ্যতে একই দুঃখের কথা জ্ঞাত করে। সাধারন তুচ্ছ জীব কালকেতু কর্তৃক দেবী চণ্ডীর অসহায় অবস্থা পদ্মার কাছে বলেছে এভাবে —

''পদ্মা দেবতা হৈয়া বন্দি থাকে দেবতা না বলি তাকে
মোর কলঙ্ক রহিল দেবলোকে।।''[১৩৬]

পদ্মা তাকে বলে যে, আহার হয়ে ক্ষুধার্ত কালকেতুর সম্মুখে আসা তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তাই সে দক্ষ জুহুরির মতো কালকেতুর পুরুষ মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে এবং দেবীকে কাঁচুলি পরিধান করে তাকে ধন প্রদান করার কথা উত্থাপন করে। সেই সঙ্গে পদ্মা চণ্ডীকে জানিয়ে দেয় যে, গরীবকে ধন দিলে জগতে তার খ্যাতি প্রচার হবে।

''পদ্মা বলে সুখী জনেক ধন দিলে দেওল প্রমাণ।
দরিদ্রকে ধন দিলে জগতে বাখান।।''[১৩৭]

অতঃপর পদ্মার সঙ্গে চণ্ডী কালকেতুর গৃহে ধন দেবার জন্য উপস্থিত হয়। সেখানে কালকেতু দেবীর প্রকৃত রূপ দেখে মূর্ছিত হয়। পদ্মার কথায় দেবী তাকে দয়ার দৃষ্টিতে বাঁচিয়ে তোলে। দেবী তাকে ধন দান করে গুজরাটের রাজায় পরিণত করে। স্বভাবতই, কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু বন্দী হয়। দেবী পূর্বের বন্দীদশার জন্য কালকেতুকে প্রতিপক্ষ ভেবে প্রতিশোধ নিতে চায়। সে সময় দেবীকে পদ্মা ব্যাধের সামনে তার গোধিকা রূপ ধারণ করে যাওয়ার ভুল উত্থাপন করে। অর্থাৎ পদ্মা চণ্ডীর সহচরী, পরামর্শদাত্রী।

পাশাপাশি ধনপতি খণ্ডে পদ্মার ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্র-সভায় রত্নমালাকে ছলনা

করতে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে পদ্মা চণ্ডীর সারথি। কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে —

''পদ্মার চলান রথ জেন চলে বাউপথ
জথা আছে সহস্র নয়ান।''[১৩৮]

এইরূপেপদ্মা দক্ষিণ পাটনে যুদ্ধে দেবীর যাত্রার সময় সারথির ভূমিকা পালন করেছে। ধনপতি ও খুল্লনার মর্ত্যে জন্মের পর চণ্ডী ধনপতিকে গৌড়ে পাঠানোর জন্য চিন্তিত হয়। এই সময় তার সঠিক মন্ত্রণাদাত্রী হয় পদ্মা। সে শারী-শুকের কথা বলে। সেই শারী-শুকের স্বর্ণখাঁচার জন্য রাজা বিক্রমকেশর তাকে গৌড়ে পাঠাবে। তাহলে ধনপতির গৌড়ে যাবার পিছনে কারণ হল পদ্মা। তাই মনে হয়, পদ্মা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী ধারায় একটি অনুঘটক।

এছাড়া দ্বিতীয়বার ধনপতিকে দক্ষিণ পাটনে চন্দন আনতে এবং রাজার ঘর থেকে চন্দন চুরির পরামর্শ, স্বামীকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য খুল্লনার দেবী চণ্ডীর পূজা ও তাতে স্বর্গ কম্পন, পদ্মাকে দিয়ে পুথিগণনা করে খুল্লনার কথা জানা, কালিদহে ধনপতিকে কমলবন দেখানো ও তাকে রাজঘরে বন্দী করার পরামর্শ পদ্মা দেয়।

''পদ্মা বলে শুন মাতা আমার বচন।
সাধুকে দেখাহ এথা কমলের বন।।
ছলন করহ মাতা অভয়া পার্ব্বতী।
রাজঘরে বন্দী জাতে হএ ধনপতি।।''[১৩৯]

চণ্ডী তার কথা মত সকল কথা শুনে। পদ্মাই যেন তার কর্ম সকল চণ্ডীর দ্বারা করিয়ে নিয়েছে।

শ্রীমন্ত চণ্ডীর ভক্ত। সে শুভ সময়ে দক্ষিণপাটনে যাত্রা করে। শ্রীমন্ত দক্ষিণ পাটনে গিয়ে পিতাকে না পেলে সে জীবন ত্যাগ করবে। তাহলে দেবীর ব্রত পূর্ণ হবে না। সেই কথা দেবীকে স্মরণ করিয়ে দেয় পদ্মা।

''পিতা শোগে মরিবে শ্রীমন্ত সদাগর।
ব্রতপুন্ন না হবে তোমার অবনী ভিতর।।''[১৪০]

তাই দেবী শ্রীমন্তকে স্বপ্নে পিতার ঠিকানা জানিয়ে দেয়। পদ্মাই দক্ষিণ পাটনের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবীকে দানাগণকে আনবার পরামর্শ দেয়।

এই ভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পদ্মা চরিত্র সামান্য কয়েকটি চারিত্রিক গুণ বহন করেছে মাত্র। তার পরিচয় পরামর্শ দাত্রী, সমস্যা সমাধানকারী, সারথি, মনোরথ সঞ্চালনকারী রূপে। চরিত্রটি আগাগোড়া একই। চরিত্রটি একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ঘটনার প্রবাহ দ্বারা কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কবি তার আগমন ঘটিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটন করতে পারেনি। তবে তার চরিত্র গুণাবলীর কাছে বা ভূমিকার কাছে চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান চরিত্র

চণ্ডীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এই কাব্যে চণ্ডীর পালিতা মাতা **মেনকা**। তার স্বামী হিমালয়। মহাভারতে তার একই পরিচয় আছে। সে সন্তান হীনা এবং সমাজের চোখে সে আঁটকুড়া। আর পাঁচজন নারীর মত সে বন্ধ্যা গৃহবধূ। সমাজের গঞ্জনা থেকে মুক্তির জন্য সে বুদ্ধির কৌশল ফাঁদে। তার পেটে দন স্বরূপ কিছু বেঁধে মানুষের বিশ্বাস জয় করে নেয়। কবির ভাষায় তার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে —

"কন্যা পাঞা মেনকা নানা বুদ্ধি বাটে।
আটকুর দাএ ঘুচাত্যে দন বান্ধে পেটে।।
দন পেটে বান্ধি রানি নগরে চলিল।
লোকে বোলেন রানি গর্ভবতি হৈল।।"[১৪১]

তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজে আটকুড়া তথা বন্ধ্যা নারীর আত্মগোপনের সচেতনতার পরিচয় পাই। চরিত্রটি এই সামান্য মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বৃহত্তর জগতের সমস্যা তুলে ধরেছে। বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহে মাতা মেনকার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তার মনে হয়েছে শিব বাদিয়ার পুত্র। তার গলায় সাপ, হাতে ডমরু, ভূত-প্রেত তার চার পাশে। এমনকি, শিব এতটাই বৃদ্ধ যে হাসতে গেলে তার দাঁত নড়ে। এরূপ পাত্রের হাতে গৌরী প্রদানের জন্য মেনকা স্বামী হিমালয়ের উপর ক্রোধ-বাণ নিক্ষেপ করেছে। কারণ কৌলিন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে নারীকে বলি হতে মাতা মেনকা প্রত্যক্ষ করেছে। মাতা হয়ে কন্যাকে এই আসন্ন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে আপোশ করেনি। বরং স্বামীর সঙ্গে সে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি, শিবের সঙ্গে স্বামীকেও পাগল বলতে বাধেনি। এরূপ পাত্রের কাছে গৌরী সম্পাদন না করে তার মৃত্যু শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। কবির কথায় —

"মেনকা বলেন রাজা তবে বলি আমি।
জেমন পাগল শিব সেই রূপ তুমি।।
কান্দিয়া মেনকা বলে গৌরী করি কোলে।
গৌরীকে লইয়া আমি ঝাপ দিব জলে।।[১৪২]

মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের অনুকূলে সৃষ্ট প্রথার চাপে নারী কেবল বলি হয়েছে। মেনকার মাতৃত্বের স্নেহময়ী রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মেনকার মতই নারী **গঙ্গা**। তার অবস্থান দেব ও ব্যাধ খণ্ডে। সে শান্তনু মুনির স্ত্রী। মহাভারত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণের গঙ্গার সঙ্গে মানিক দত্ত লৌকিক ধারণার প্রলেপ দিয়েছেন। শিব তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে শর্ত করে বিবাহ সভায় রন্ধন করতে নিয়ে আসে। সে বাঙালী গৃহবধূ। কিন্তু শিব কর্তৃক শর্তভঙ্গ হলে তার

জীবনে নেমে আসে অভাবনীয় চরম পরিণতি। স্বামী কর্তৃক সে পরিত্যক্ত হয়। দাম্পত্য জীবনে নারীর করুণ পরিণতি তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নিরুপায় আশ্রয়হীনা অবলা নারী গঙ্গা বাধ্য হয় শিবকে অবলম্বন করে আশ্রয় নিতে। মানিক দত্তের কাব্যে গঙ্গার সেই অবলম্বনও স্থায়ী হয়নি। তার আশ্রয় হয়েছে পরিচিত লোকালয় থেকে বহুদূরে সান্তালী পর্বতে। তার এই পরিচয়ে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাঁড়ু দত্তকে বিড়ম্বনা করতে তার কাছে শিব পত্নী চণ্ডীর সমাগম হয়। গঙ্গা অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে চণ্ডীকে তার মনোবাঞ্ছার ক্রোধ ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে। গঙ্গা বলেছে —

''জে দিনে আসিয়াছ তুমি কথা বন্যা পাব আমি

শুকাইয়া মরে ই মছ্য মগর।''[১৪৩]

তাতে উভয়ের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। গঙ্গা সেখানে চণ্ডীকে অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। উভয়ের কোন্দল সতীন সমস্যাজাত। তাতে গঙ্গা চরিত্রে দেবত্বের গুণাবলী অতিক্রম করে গ্রাম্য অসংস্কৃত নারীতে পরিণত হয়েছে।

তবে, **কালী** চরিত্রটি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। তার অবস্থান দেবখণ্ডে এবং জন্ম অলৌকিক রহস্যজাত। চণ্ডীর দেহ নিষিক্ত ঘর্ম থেকে তার জন্ম। সে চণ্ডীর অন্য রূপ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে তার জন্ম সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে —

''শরীরকোষাদ্‌যৎ তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা

কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে।।

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভুৎ সাপি পার্ব্বতী।

কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া।'' ৪১[১৪৪]

অর্থাৎ , ''অম্বিকা সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে উৎপত্তি লাভ করেন, এইজন্য সমস্ত ভুবনে তিনি 'কৌষিকী' বলে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই কৌষিকী দেবী, শরীর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে পর, পার্ব্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি কালিকা নামে কীর্ত্তিতা হইয়া হিমাচলে অবস্থিতি করিলেন।''[১৪৪] তার প্রচণ্ড সংহার রূপটি এখানে বড় হয়ে উঠেছে। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তার পরাক্রমী সংহারকারিণী রূপ স্পষ্ট। তার ক্রোধান্বিত চেহারা লক্ষ্য করে শিব সৃষ্টি রক্ষার জন্য চিন্তিত। তাই সে তার পদতলে শবরূপে পতিত হয়। পদতলে স্বামীকে দেখে তার লজ্জায় জিহ্বা দণ্ডে চাপা দেয় এবং ক্রোধ নিবারণ করে। কবির ভাষায় —

''পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।

দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।''[১৪৫]

কালীর এইরূপে শিব ও শক্তির মহিমা ভাস্বর হয়ে ওঠে।

দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে সন্তানদের লালন পালনের জন্য ইন্দ্র সভার থেকে পাঁচ জন নারীকে আনা হয়। তাদের দ্বারা সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক উদ্‌ভাসিত হয়। তারা হল **হারা, তারা, সত্যা, কমলা** ও **পদ্মা**। এরা সকলে বৃত্তিতে দাসী। তাদের কাজ সন্তান লালন পালন করা। সেই সঙ্গে এই শ্রেণীর নারীরা উচ্চবিত্তের কাছে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হত। প্রসঙ্গত, অতুল সুর বলেছেন — ''হিন্দুসমাজে দাসদাসী কেনা ও রাখা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল, তা নয়। ... অনেকে আবার যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত।''[১৪৬] শিবের এই দাসীদের প্রতি কাম মনোভাব প্রকাশ উক্ত বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততাকে প্রমাণ করে। কবির ভাষায় —

''হারা তারা আইলা আর আইলা সত্যা।
কমলাকে সাথ করি আইলা পদ্যা।।
* * *
জেন মাত্র মহাদেব দাশীকে দেখিল।
মদনে বিভোর হৈঞা সাক্ষাতে আইল।।''[১৪৭]

দেবী চণ্ডী তাদের উপর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে কালকেতু ছলনার জন্য যায়। নারীদের দাসী বৃত্তি ছাড়াও রথ চালনার পরিচয় পাওয়া যায়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর মর্ত্যভূমিতে যাত্রা পথে তারা সারথির ভূমিকা পালন করেছে। তারা হল **ইমলা** ও **বিমলা**। এরা চণ্ডীর পথ প্রদর্শক। দেব সমাজে এদের অবস্থান সর্বনিম্নে বলে মনে হয়। এই বৃত্তিতে নারীর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নশ্রেণীর নারীদের সমাজে অর্থের প্রয়োজনে শ্রম করতে বাধা ছিল না। এমনকি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার স্পষ্ট ধারণা মেলে।

শিবের সঙ্গে চণ্ডীর গার্হস্থ জীবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের গার্হস্থ জীবনে **জয়া** ও **বিজয়া** নামে দু'জন পরিচায়িকার উল্লেখ রয়েছে। 'দেবী-ভাগবত'-এ জয়া-বিজয়া দেবীর অপর নাম। সেখানে বলা হয়েছে — ''আপনিই জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ইচ্ছা ও দয়ারূপে অবিস্থিতি করিতেছেন।''[১৪৮] আর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি দাসীর নাম জয়া বিজয়া। এখানে বলা হয়েছে —

''শিবের বচন শুনি তুষ্ট হৈল নারায়ণী
জয়া বিজয়া রন্ধন সাজ করে।''[১৪৯]

শিব ও চণ্ডীর গার্হস্থ জীবনের পাশাপাশি ইন্দ্র ও শচীর গার্হস্থ জীবনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে জীবন্ত। চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রকে বর দান এবং ঘটনা দ্বারা ব্যাধ খণ্ডের বীজ সুপ্তের পরিকল্পনা। সেই ইন্দ্রের স্ত্রী **শচী**। উল্লেখ্য ইন্দ্র শৈব। পুত্র নীলাম্বরকে শচী স্বীয় গর্ভে ধারণ

করে। ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে। পুরাণে তার স্বামী ইন্দ্র। তার পুত্র জয়ন্ত ও কন্যা জয়ন্তীর নাম পাওয়া যায়। সেখানে শচীর নীলাম্বর নামে কোন পুত্রের উল্লেখ নেই। এখানে শচীর পুত্র নীলাম্বর; তার জন্মের পর নানরকম শুভানুষ্ঠান ও পুত্রের বিবাহ যাত্রার সময় কল্যাণ কামনা করা বাঙালী মাতার গুণাবলী বহন করে। এমনকি, পুত্রের কল্যাণে সে গৃহে দেবী চণ্ডীর ঘটপূজা করে। তার মত গৃহবধূর দেবী চণ্ডীর প্রতি বিশ্বাস একটি দ্বান্দ্বিক আভাস দেয়। প্রসঙ্গত, তারই একই গৃহের স্বামী, পুত্র ও নারদ শৈব ধর্মের প্রতি আস্থাবান। দেবী চণ্ডীর ভক্ত শচী তার পুত্রকে হারাল তার অভিশাপেই। পুত্র নীলাম্বরের বিচ্ছেদ ভাবনায় তার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল। এই বিচ্ছেদ ভাবনা স্বর্গপুরে শোকের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বণিক খণ্ডে রত্নমালার অভিশাপ প্রাপ্তি অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ। **রত্নমালা** ইন্দ্রের সভার নর্তকী। তার স্বামী জয়ধর ও পুত্র মালাধর। পুত্র বধূ **উলুবা** ও **দুলুবা**। রত্নমালার সঙ্গে পাঁচজন নর্তকী রয়েছে। তাদের নৃত্য দেখতে ইন্দ্র সভায় উপস্থিত হয় চণ্ডী। সেকারণে বার্তা প্রেরক মাতুলিকে দিয়ে পুনরায় তাদের ডেকে পাঠানো হয়। মাতুলি চরিত্রটি সংবাদ প্রেরক ও ইন্দ্রের আজ্ঞাবহ দাসী। চণ্ডীর আগমন বার্তা সে রত্নমালাকে জানায়। কিন্তু রত্নমালা ও তার নৃত্যসঙ্গীরা একবার নৃত্য করে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত। পুনরায় সপ্তসরাতে নৃত্যের কথা শুনে তারা আক্ষেপ করে। কবির কথায় —

> ‘‘মহা পরিশ্রম করি বসিছে পঞ্চজন।
> শুনিয়া বিফল হৈল নিত্যের কথন।।
> এহি দণ্ডে নিত্য করি মোরা আইলাম ঘরে।
> পাছে ২ আইলা তুমি ডাকিবার তরে।।’’[১৫০]

ইন্দ্রের রাজসভায় রত্নমালা ও পাঁচজন নামহীন নর্তকী কায়িক শ্রমের দ্বারা অত্যাচারিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত। তাদের মত নিম্নবর্ণের নর্তকীদের পরিশ্রম ও মানসিক অবস্থার মূল্য উচ্চবর্ণের রাজাদের কাছে নেই। তারা তাদের কাছে আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী মাত্র। তারা সেই নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতিভূ। তারা কেবল উচ্চবর্ণের জন্য নিজেদের সখ-আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে কিছু পায়নি। তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলতে বাধ্য হয় যে, ইন্দ্রের সভা ত্যাগ করে শিবস্থানে যেতে। কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতি ও আর্থিক অবস্থার জন্য ক্ষমতার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ইন্দ্রস্থানে চণ্ডীর সম্মুখে না গিয়ে শিবস্থানে যাওয়ার কথা উত্থাপনের মধ্যে শিব ও শক্তির দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তারা দেবী চণ্ডীর সামনে নৃত্য করতে বাধ্য হয়। নৃত্যাঙ্গনে যাত্রা পথে রত্নমালা অমঙ্গল ও অকুশলতার আভাস পায় —

> ‘‘জাত্রা করি রত্নমালা গমন করিল।

অমঙ্গল অকুশল পথেত দেখিল।।''[১৫১]

লক্ষণীয় যে, মূল রাজসভা থেকে তাদের মত নিম্নবর্ণের নর্তকীদের অবস্থান অনেকটা দূরে ছিল বলে মনে হয়। রত্নমালার যাত্রায় কবি তার আভাস দিয়েছেন। রত্নমালা নৃত্যে তার পুত্র বধূরা উলুবা-দুলুবা গানের রাগ ধরে। উলুবা-দুলুবা গানের সঙ্গে করতালি দ্বারা সভায় উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমে তারা 'শ্রীগন্ধা' রাগে গান করে। তাতে শাশুড়ী রত্নমালা নৃত্য করে। প্রথমবার তার নৃত্যে তালভঙ্গ হয়। তাই দ্বিতীয়বার নৃত্য করতে তার মনে সাহস জাগে না। তার মন অভিশাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এই দ্বিধাগ্রস্ততায় রত্নমালা দ্বিতীয়বার নৃত্যে তালভঙ্গ করে বসে। এবং তাকে মর্ত্যে মানব উদরে জন্ম গ্রহণের অভিশাপ দেয়। রত্নমালা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। তাতে পরিবার ভাঙ্গনের বিচ্ছেদ-বেদনায় বিধুর।

ইন্দ্রের রাজ সভায় অপর একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র **মাতুলী**। পুরাণে তার পরিচয় ইন্দ্রের সারথি ও সখী হিসাবে। রামায়ণে ইন্দ্রের আদেশে সে রামের জন্য রথ নিয়ে উপস্থিত হয়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার ভূমিকা স্বতন্ত্র। সে এখানে কেবল সংবাদপ্রেরক। মানিক দত্তের কথায় — ''মাতলী বোলেন ইন্দ্র দ্বারেত ভবানী।''[১৫২] মাতুলী ইন্দ্রকে চণ্ডীর আগমন বার্তা ইন্দ্রদ্বারে প্রেরণ করে।

এবার আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ খণ্ডের প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনায় আসব।

আখেটিক খণ্ডের একটি অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র **কালকেতু**। জীবিকায় সে ব্যাধ ও পরিচয়ে ব্যাধ সম্প্রদায়। তার পিতা ধর্মকেতু ও মাতা নিদয়া। তার স্ত্রী ফুল্লরা। দেবীর কৃপায় সে বিবাহের পরে গুজরাট রাজ্যের রাজা হয়। তার চরিত্রের এই পরিবর্তন কতটা স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের বিষয়। এক্ষেত্রে আমরা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী ধারাকে চিহ্নিত করে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

বস্তুতঃ কালকেতুর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। ক) বিবাহের প্রাক্কালে কালকেতু, খ) সংসারী কালকেতু, গ) ধন লাভের পর কালকেতু, ঘ) রাজা কালকেতু এবং ঙ)অন্তিম জীবনে রাজ্যভার-ত্যাগী কালকেতু। এই পাঁচটি ভাগে আমরা কালকেতুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গতি কতটা তা লক্ষ্য করব।

ব্যাধ খণ্ডে কালকেতুর প্রথম পরিচয় হল সে স্বর্গের অভিশপ্ত নীলাম্বর। সে শিব ভক্ত। দেবীর উদ্দেশ্য পূরণে সে শিকারে পরিণত হয়েছে। তার চিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মর্ত্য মানুষের ন্যায় সে তার স্বাধীনতা ব্যক্ত করতে পারে না। দেবীর ছলনায় তার জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। শিব পূজার জন্য ফুল তুলতে গিয়ে সে মর্ত্যে

স্বাধীন মুক্ত ব্যাধের জীবন পর্যবেক্ষণ করে। সেই জীবন লক্ষ্য করে সে গণ্ডীবদ্ধ প্রথাগত নিয়মমাফিক জীবনের প্রতি অনীহা অনুভব করে। স্বাধীন ব্যাধ জীবনের প্রচ্ছন্ন মুক্তির চাঞ্চল্য তার মনকে দোলা দিয়ে যায়। তাই সে মনে মনে বলে —

''ব্যাধকে দেখিয়া নীলাম্বর ভাবে মনে।
বৃথাই ইন্দ্রের পুত্র হৈলাঙ অকারণে।।
খুধাএ দুঃখ পাইঞা অরণ্যে বেড়াই।
শিব পূজা না করিলে খাত্যে নাই পাই।।
নীলাম্বর বলে বৃথা ফুল তুলি ফিরি।
ব্যাধ জন্ম হৈলে আমি খাত্যাঙ পশু মারি।।''[১৫৩]

এই মুক্ত ভাবনায় ডুবে থাকায় সে অসচেতনতার কাজ করে বসে। সে শিব পূজার জন্য ছদ্মবেশী দেবীর কীটযুক্ত ফুল তুলে আনে । সেই কীট শিবকে দংশন করে। সে অকপটে ভালো-মন্দ বিচার না করে সহজ সরল ভাবে সত্য কথা বলে। সে কথা শুনে ক্রোধান্বিত শিব তাকে মর্ত্যে ব্যাধগৃহে জন্মাবার অভিশাপ দেয়। শিবের অভিশাপে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সাধারণ নির্যাতিত অসহায় মানুষগুলি কীভাবে সামান্য ভুলে কঠোর শাস্তি পেত এবং প্রভু বা ক্ষমতাবানের কাছে তারা নত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ত, কিন্তু প্রতিবাদের মুখ খুঁজে পেত না তার উজ্জ্বল প্রতিভূ নীলাম্বর চরিত্র।

অতঃপর অভিশপ্ত নীলাম্বর মর্ত্যে ধর্মকেতু ও নিদয়ার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। বাল্যকালে সে অত্যন্ত শক্তিশালী ও পশু-পাখি শিকারে পারদর্শী ছিল। তার পরিচয় এরূপ —

''পানির মদ্ধে উদ্‌ভেলা তাখে বিন্ধে শরে।।
মালসাট মারি ছাইলা হস্তে লোফে শেল।
সরিষা চাপিয়া গায়েত মাখে তেল।।
হাটুয়াত ভাঙ্গে নারিকেল।
মুকুটিয়া ভাঙ্গে বেল।।
ইটা গোটা মারে পড়ে সমুদ্রের পার।
পাথর গোটা মারে পড়ে লঙ্কার দ্বার।।
পুত্রের বিক্রম দেখি পিতার আনন্দ।
বৈরাট নগরে কৈল পুত্রের সমন্ধ।।''[১৫৪]

বিবাহের প্রাক্‌কালে কালকেতু অশিক্ষিত, সংস্কারহীন, বীর ও বর্বর। ক্ষেত্র গুপ্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''কালকেতু বীর শিক্ষা-

সংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ।''[১৫৫] ব্যাধ সন্তান রূপে অঙ্কনেই কবির এরূপ বর্ণনা। তার হৃদয়বৃত্তির তুলনায় কবি তাকে শারীরিক শক্তি বিকাশের দিকে মনোযোগী হয়েছেন।

কালকেতুর বীর বিক্রম দেখে পিতা ধর্মকেতু তার বিবাহের ব্যবস্থা করে। স্বর্ণকেতুর কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের স্বল্প পরেই কালকেতু তার পিতা-মাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে হারায়। কবি এখানে ব্যাধ কালকেতুকে সংসারী ও দায়িত্বের মধ্যে ঠেলে দেন। শুরু হয় কালকেতুর দাম্পত্য জীবন। সে পশুপাখি শিকার করে। শিকারজীবী কালকেতু পশু পাওয়ার জন্য দেবী চণ্ডীর চরণপদ স্মরণ করে গৃহ থেকে বের হয়। চণ্ডীর সঙ্গে তার মধ্যে সমকালীন রামভক্তিও লক্ষ্য করা যায়। শিকারে এসে কালকেতু একান্তে বসে রাম নাম গান করে।

''পঞ্চম আলাপিআ রাম নাম গান করে
হরিনি মঙ্গল শোনে।।''[১৫৬]

রাম নামের শুভ বা মঙ্গল গান শুনে হরিণী মোহিত হয় এবং কালকেতু তাকে শরবিদ্ধ করে। হরিণীর করুণ অবস্থা দেখে তার চিত্ত আকুল হয় এবং সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে কান্না করে বলে—

''ছাড় জাউক মোর ই শর সন্ধানে
ছার জাউক দক্ষিন হস্তে।
আমি কি জানিব পণ্ডিত হরিনি
বজ্র পড়ুক মোর মাথে।।''[১৫৭]

হরিণীর দুঃখে সে সমব্যথী। তার চরিত্রের বীর বিক্রমের পরিচয় থাকলেও সে অপরের দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করতে পারে নি। এখানে কালকেতু চরিত্রটি অত্যন্ত মানবিক গুণসম্পন্ন।

সে শিকারের মাংস ফুল্লরাকে বাজারে বিক্রি করার জন্য আদেশ দেয়। ফুল্লরা তাদের দাম্পত্য জীবনে অভাব অনটনের জন্য কালকেতুকে দোষারোপ করে। তা শুনে সে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে। সে আবেগপ্রবণ। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার বীরত্ব ও আত্মশক্তির পরিচয় দেয় নি। বরং স্ত্রীর কথায় সে প্রেরণা শক্তি হারিয়েছে। ফুল্লরা তাকে বলে —

''প্রভু পুরূস হয় না হইয় কাতর।
পুরূস কাতর জারা স্ত্রিয় বিদায় দেয় তারা
ফুলুরা জাইবে অন্যতর।।''[১৫৮]

এই কথা শুনে কালকেতু শিকারে বের হয়। পশুরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়। পশুদের রক্ষার জন্য দেবী গোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করে। গোধিকা বন্ধন করে

কালকেতু 'ধনিয়া ডাঙ্গা'য় আসে। সেখানে বেরনিয়া বা 'বেরনিএগ' নামে এক কাষ্ঠবিক্রেতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। নিজেকে ঊর্দ্ধে প্রকাশ করার জন্য কালকেতু তার অধিক উপার্জন এবং বীরত্বের আত্মঅহমিকা প্রকাশ করেছে। সে তাকে তার কর্ম এবং উপার্জনের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করে। তার দেড়বুড়ি কড়ি প্রতিদিন উপার্জন শুনে কালকেতুর লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। কবির ভাষায় —

''এতেক শুনিয়া বীর হেট কৈল মাথা।
ধরিআ দিলেন কোল তুমি আমার মিতা।।''[১৫৯]

মুখলজ্জা নিবারণের জন্য সে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে চেয়েছে। তবুও সে বলে তাকে পিছনেই নিয়েছে। কালকেতুর মতো বীর চরিত্রে কবি মধ্যবিত্তের স্বভাব লক্ষণটির সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। তাই কালকেতুকে মধ্যবিত্ত মানসিকতার চরিত্র বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

অন্যদিকে, শক্তিশালী বীর কালকেতুর ভোজনরসিকতা অত্যন্ত উপভোগ্য বিষয়। বিত্তহীন, অভাবের দাম্পত্য জীবনে কালকেতুর ভোজন অসংগতি বলে মনে হয়। কবি হয়তো দুঃখ, অভাব ক্লীষ্ট ব্যাধ জীবনে কল্পনার স্বর্গ রচনা করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভোজন রসিকতা করেছেন। কালকেতুর ভোজন বর্ণনায় মানিক দত্ত লিখেছেন —

''আম্বানি খাইতে প্রভু তোর থাকে সাদ।
কাটিআ আনহ খুদিআ মাণের পাত।।
খুদিআ মাণের পত্র আনিল কাটিআ।
সাত হাড়ি আম্বানি দিলেন ঢালিআ।।
পত্রে না রয় আম্বানি গড়াগড়ি জায়।
* * *
ছয় বুড়ি কুচিলা খাইল নয় বুড়ি ধুতুরা।
আড়িতে মাপিআ খাইল জটিয়া ভাঙ্গের গুড়া।।''[১৬০]

অতঃপর কালকেতু পশুশিকারে বের হয়। সেখানে দেবী তাকে চোখে ধুলো ছুঁড়ে মারলে কালকেতু চোখে কোন পশু দেখতে পায় না। এদিকে ফুল্লরা তার প্রতি প্রত্যাশা নিয়ে ঘরে অপেক্ষা করে। এরূপ সংকটাবস্থায় কালকেতু আত্মজিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে পড়ে।

''আওাশে বসিয়া মহাবীর কান্দে তরুতলে।
না পাইয়া বনের মৃগ ঘরে জাব কুন ছলে।।
আমার ইষ্ট নাই কুটুম্ব নাই জে তারে পদার্থিব।

কড়াকের সম্বল নাই জে ঘরে বসিয়া খাব।।''[১৬১]

তার দুঃখে চণ্ডী গোধিকা রূপে ধরা দেয়। সে গোধিকা নিয়ে গৃহে ফিরে এবং ফুল্লরাকে রন্ধন করতে বলে সে স্নানে যায়। এদিকে দেবী গোধিকা থেকে ষোড়শী রমণীতে পরিণত হয়। তাকে দেখে ফুল্লরা কালকেতুর সম্মুখে সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তখন কালকেতু অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ফুল্লরাকে বলে —

''না দেখাইতে পার জদি মোর বিদ্যমান।
চিড়াইড়ে কাটিব তোর নাক আর কান।।''[১৬২]

তার মধ্যে রোমান্টিকতার লেশ মাত্রও নেই। সে গৃহে দেবীকে দেখে বিনয়ের সঙ্গে বিদায় দিতে চায়। সে যেমন স্ত্রী জাতীর মান-সম্মান সম্পর্কে সচেতন তেমনি রাজদণ্ড হবার আশঙ্কায় চিন্তিত। তা সত্ত্বেও দেবী তার গৃহ ত্যাগ করতে নারাজ। তখন ব্যাধ কালকেতু উগ্র ক্রোধবশত দেবীকে বাণ মারতে উদ্ধত হয়। কিন্তু দেবীর মায়ায় সে ব্যর্থ হয়।

সুতরাং সংসারী কালকেতু শিকারজীবী ও বীর। তার সমস্ত কার্য ও চারিত্রিক গুণাবলী ব্যাধজীবনকে ঘিরেই অতিবাহিত হয়েছে। তার ফলে চরিত্রটি ব্যাধ জীবনের ফটোগ্রাফী হয়েছে, জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''সে বীর, কিন্তু বীরত্ব তাহার কৃত্রিম অনুশীলনের বিষয় ছিল না, ইহা তাহার সহজাত গুণ মাত্র ছিল। সেইজন্য বীরত্ব সম্পর্কিত কোনও সমাজ-নির্দিষ্ট আদর্শকে সে স্বীকার করে নাই, এই বিষয়ে সে তাহার জন্ম-সংস্কারকেই অনুসরণ করিয়াছে।''[১৬৩]

এরপর কালকেতুর দেবী কর্তৃক ধনলাভ। দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরী পেয়ে সে হতভম্ব। অভাবনীয় অতিমূল্যের দ্রব্য ভারে তার বাক্‌রুদ্ধ হয়েছে। সাধারণ দরিদ্র ব্যাধের পক্ষে এরূপ অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক।

''অঙ্গুরি লইয়া বীর নাড়ে আর চাড়ে।
ভয়ে কালকেতু তবে রাও নাই কাড়ে।।''[১৬৪]

দেবী তাকে ধন দিতে চাইলে ফুল্লরা তাতে বারণ করে। তখন কালকেতুর সহজ সরল লোভী মানুষটি ভিতর থেকে জেগে উঠে। পরক্ষণে আবার নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। তার মধ্যে সমাজ ভয় জাগ্রত হয়।

''ধনের কারণে লোকে ঠগাই করিবে
রাজ স্থানে করিবে গোহারি।।''[১৬৫]

স্বার্থপর, বিবেকহীন মানুষের দ্বারা কালকেতুর মত সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ঠকেছে তার প্রমাণ

এই উক্তিটি। সেই সঙ্গে কালকেতুর দোলাচল মনেরও পরিচয় পাই। এখানে তাকে রক্ত মাংসের জীবন্ত চরিত্র বলে মনে হয়।

দেবীর ধন লাভ করেও কালকেতুর মধ্যে তার নিজস্ব জীবিকা সম্বন্ধে ভালোবাসা কমে না। দেবীর সাত ঘড়া ধনের সমান তার একটি মৃগ — একথা সে দেবীর সম্মুখে বলেছে। তার কাছে ধনের তুলনায় শিকারের মূল্য অনেক বেশি। অতঃপর সে দেবীর ধন নিয়েছে এবং সে দেবীকে তা বহন করতে দিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তবে তার সঙ্গে ছিল ব্যাধসুলভ ক্রোধ।

''কালকেতু বীর তবে বলে ক্রোধ হৈয়া।
আমার ধন লইয়া জদি জাও পলাইয়া।।
পুন কালকেতু বলে ভবানীর তরে।
পিতার উম্মরের ধন পাইলাঙ এতকালে।।
* * *
আগু২ জায়ে বীর পাছু পানে চায়ে।
ধনঘড়া লইয়া পাছে ভবানী পলায়ে।।''[১৬৬]

এখানে কালকেতু রুক্ষ, অহংকারী ও সন্দেহপরায়ণ চরিত্র।

ধন লাভ করে কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হয়। তার একমাত্র প্রতিপক্ষ কলিঙ্গ রাজা সুরথ। সে অন্যের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করতে চায়নি। তার কাছে অন্যের সাহায্যে যুদ্ধে জয় লাভ করা পরাজয়ের সামিল। তাই কলিঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবী তাকে রক্ষা করলেও কালকেতু নিজের শক্তি পরখ করতে চেয়েছে। সে বলে —

''তিন দ্বার জিনিলাম দুর্গার বাহুবলে।।
আপনার বল কিছু না বুঝি আপনি।
কত কাল আমার শএ থাকিবে ভবানী।।''[১৬৭]

এখানে কালকেতু আত্মশক্তি জাগ্রত করতে এবং স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিকটি তার চরিত্রে একীভূত হয়ে গেছে। সে কলিঙ্গরাজ সুরথকে পরাজিত করে গুজরাট নগর পত্তন করে। তার মত ব্যাধের পক্ষে সমাজ বর্হিভুত গুজরাট নগরের রাজা হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে, অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন — ''... দেবী কলিঙ্গরাজের কাছ থেকে পরাজিত শত্রু কালকেতুর প্রতি সম্মাননা এবং স্বীকৃতি আদায় করে নিলেও সমাজ-সংস্থায় তার স্থান স্বীকৃত হয়নি; তাকে গুজরাটের বনেই প্রত্যাবর্তন করতে হলো। ... প্রচলিত সমাজে তখনও সে আসন লাভ করেনি। তার সামাজিক সম্মাননা বা স্বীকৃতি কিছুই নেই। সমাজে অধিষ্ঠান তখন তার নিকট দুরাশা। অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে তার আদর্শ রাজ্য ও সমাজ; সেখানকার নিয়মকানুন দিয়ে কলিঙ্গ প্রভাবিত

হবে না, অথবা কলিঙ্গের প্রভাবও গুজরাটে অনুভূত হবে না। পারস্পরিক সম্পর্কের এই সমাধান কলিঙ্গের দিক থেকে শ্রেয়।''[১৬৮] দেবী শরণে পরাজিত সুরথ কর্তৃক কালকেতু বন্দী হয়। অতঃপর সে দেবী কর্তৃক বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার হয়। কালকেতু ভাঁড়ুর প্ররোচনা অনুধাবন করে। তাই কালকেতুর অসৎ, মিথ্যাবাদীদের বিরোধিতা আপাত অর্থে ভাঁড়ুর প্রতি হলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে দেবীর প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করে। কেননা, কালকেতু বারবার দেবীর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে তার জীবিকাকে অবলম্বন করে শান্তিতে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কালকেতু রাজদরবারে অপমানিত হলে ক্রুদ্ধ ভাঁড়ু দত্ত সকলের সম্মুখে কালকেতুর পূর্ব জীবনের জীবিকা ও জন্ম সূত্র তুলে ধরে। কালকেতু ভাঁড়ুর মুখে চরম সত্য কথা শুনে কোন কথাই বলে না। কারণ ভাঁড়ুর বিরোধিতা করলে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠতে পারে' সেই ভয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। আজ তার হঠাৎ রাজা হওয়ার কারণ ও তার বংশ মর্যাদা অজ্ঞাত প্রজাদের সামনে উন্মুক্ত হলে প্রজা সকল তাকে রাজা বলে মানবে না। তাই কালকেতু ভাঁড়ুকে অধম অপবাদ দিয়ে নিজের সাময়িক দ্বন্দ্ব, আচমকা কেঁপে ওঠা মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে মাত্র। অতঃপর ভাঁড়ুর সঙ্গে কলিঙ্গ সৈন্য তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছে। সেই সময় ফুল্লরার নির্বুদ্ধিতায় কালকেতু বন্দী হয়। কিন্তু সে বল বিক্রমের পরিচয় অক্ষুন্ন রেখেছিল। এখানে কালকেতু বুদ্ধিবলের তুলনায় দেহ বলই বড় হয়ে উঠেছে। সুতরাং গুজরাট রাজা কালকেতু দেবীর দ্বারা পরিচালিত ও নির্দেশ পালনকারী চরিত্র। তবে তার মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বীজ সুপ্ত ছিল। চণ্ডীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সে একটু ম্লান হয়ে পড়েছে। তাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজা কালকেতুর ক্ষত্রিয় গুণ নেই, বরং ব্যাধ রক্ত তার মধ্যে সর্বত্র বহমান তার বহিঃপ্রকাশ দেখি রাজা কালকেতুর মধ্যে। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের কালকেতু চরিত্র সম্বন্ধেও প্রণিধানযোগ্য — ''আর্য বা ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ ও অনার্য বীরত্বের আদর্শ এক নহে। ... সে অনার্য, সুতরাং তাহার বীরত্ব কাপুরুষতামিশ্র, আত্মরক্ষার ধর্ম তাহার জীবনধর্ম।''[১৬৯] কালকেতুকে রাজা রূপে অঙ্কন করেও মনোবৃত্তির দিক থেকে সে ব্যাধই রয়ে গেল।

রাজ্য ত্যাগের পর কালকেতুর মধ্যে পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়। এই সত্তা এতদিন সুপ্ত ছিল। ভাঁড়ু দত্তের আঁটকুড়া অপবাদের প্রতিক্রিয়ায় তার এই সত্তার জাগরণ। সে আত্মদ্বন্দ্বের জ্বালায় বলে —

''কোন ছাড় দত্ত ভাড়ুয়া নাবড় সে মোকে আটকুর বোলে
এত দুঃখ না সয় শরীরে।''[১৭০]

কালকেতুর এই প্রতিক্রিয়া তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছে।

এইরূপ ব্যাধ খণ্ডের প্রধান নারী চরিত্র **ফুল্লরা**। সুকুমার সেন বলেছেন 'ফুল্লরা' নামটি

''সরাসরি অপভ্রংশ-অবহট্ট হইতে আগত। ফুল্লরার সহিত আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী হইতে আগত (?) 'ফুলুরি' ও 'ফুলেল' সংপৃক্ত।''[১৭১] ফুল্লরার অর্থ হতে পারে এই রকম। 'ফুল্ল' অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পুষ্প। প্রফুল্ল, প্রসন্ন অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'রা' বিশেষণ ফুলের মালা। সব মিলিয়ে বিকশিত পুষ্পদামের ন্যায় প্রফুল্ল নারী। প্রেম ও সৌন্দর্য তার জীবন। সেই-ই ফুল্লরা। তার স্বামী এবং মাতা-পিতা ব্যাধ শ্রেণীর। তার এই ফুল্লরা নামের পেছনে ব্যাধ জীবনের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুল্লরা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে — ''ফুল্লরা — ফুল্ল (= প্রফুল্ল = স্পষ্ট) রা (= রব) যাহার — মাংস বিক্রিয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উচ্চস্বর থাকা গুণাবহ ভিন্ন স-দোষ বোধ হয় না, সুতরাং ফুল্লরা নাম নিরর্থক নহে।''[১৭২] এই ধরনের নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী ফুল্লরার চরিত্রে কবি মানিক দত্ত সামাজিক কুপ্রথার সমস্যা ও মাঝে মাঝে পৌরাণিক প্রসঙ্গ তার মুখে তুলে ধরেছেন। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ব্যাধ খণ্ডের প্রধান নারী চরিত্র ফুল্লরাকে সতীন সমস্যার পটভূমিকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাতে তার ব্যাধ জীবনের দুঃখ, স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও সৌন্দর্যময়ী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ফুল্লরা চরিত্রকে কাহিনী ধারা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। প্রথমত, ষোড়শী কন্যারূপী দেবী চণ্ডীর আসার পূর্বে ফুল্লরা চরিত্র; দ্বিতীয়ত, ছদ্মবেশী দেবীর আগমনে ফুল্লরা চরিত্র; তৃতীয়ত, ধন লাভের পর ফুল্লরা চরিত্র।

মানিক দত্তের ফুল্লরা নিশানকেতু ও দয়াবতীর কন্যা। কালকেতুর সঙ্গে তার বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। সে খুবই সুন্দরী। দাম্পত্য জীবনে তার এই রূপই 'আপনা মাংসে আপনে বৈরী' হয়ে দাঁড়ায়। কালকেতু শিকার করে যে মাংস আনে তা তাকে শ্রীকলার বাজারে বিক্রি করতে বাইরে বেরোতে হয়। তার মত সুন্দরী রমণী বাইরে বেরোলে কীরূপ অশ্লীল ও অশালীন আচরণ সহ্য করতে হয়, তা ফুল্লরার কথায় বোঝা যায়। সে বলেছে —

''মাথায় মাংসের ডালি নগর বাজারে জাব
কম্পিত হৈবে মহাজন।।

* * *

মাথায়ে মাংসের ডালি বেড়াইমো বাড়ি বাড়ি
লোকে ব্যাধিনি কহিবে আমারে।।''[১৭৩]

লোকে তাকে 'ব্যাধিনি' বলুক এটা সে সহ্য করতে পারে না। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তাই সে বাজারে মাংস বিক্রি করতে নারাজ। কিন্তু অভাবের সংসারে তাকে বেরোতেই হবে। সে নিজের ভাগ্যের প্রতি দোষারূপ করে বলেছে —

''দ্বারেত বসিয়া কান্দে রামা ফুলুরা
কি আছিল অভাগির কপালে।
কেমন বিধাতা মোরে জনম লভাইল
দুষ্ট অক্ষটির ঘরে।''[১৭৪]

বাল্য বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়ে অসহায় ফুল্লরার একমাত্র অবলম্বন হয়েছে স্বামী কালকেতু। সেই সংসারেও দারিদ্রের অভাব নেই। সেই অবস্থায় ফুল্লরা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতির উপর উচ্চশ্রেণীর অবহেলার দিকটি ফুল্লরার কথায় সুপ্ত রয়েছে।

ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে ঘনিয়ে আসে ভাগ্যের পরিহাস। সে বাধ্য হয় বাজারে মাংস বিক্রী করতে। সেখানে ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর ছলনার শিকার হয়। দেবীর ছলনায় ফুল্লরার সকল মাংস চিলে ভক্ষণ করে। তার ফলে সে ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ করে কালকেতুর সামনে ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। কালকেতুও স্ত্রীর দুঃখে সমবেত হয়েছে। কালকেতু তার অভাবের সংসারের কথা বলে আত্মধিক্কার দেয়। তখন স্বামীকে সে আশ্বাসবাণী শুনায়।

''প্রভু পুরূসের দশ দশা কখন গরিব কখন রাজা
কখন হৈতে পারে দণ্ডের মদন।
পৃথিবীতে ঝড় হয় সেহ কতক্ষন রয়
দুখ সুখ প্রভু পূর্ব্বেকার ভজন।।''[১৭৫]

ফুল্লরা দারিদ্রের দুঃখে নতোদর হলেও কালকেতুর মত ভেঙে পড়েনি। বরং সে মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছে। দুর্বল চিত্ত স্বামী কালকেতুর মনে পুরুষত্বের সঞ্চার করার জন্য উদ্দীপনা যোগায়। দুঃখ-সুখ ও অর্থ জীবনে পরিবর্তনশীল। আজ তারা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। এই চিরন্তন বিশ্বাসে আত্মস্থ ফুল্লরা। নিম্নশ্রেণীর নারী ফুল্লরার এই প্রত্যয় তাকে কিছুটা আধুনিক নারীতে পরিণত করেছে, বললে অত্যুক্তি হবে না।

ফুল্লরার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি গৃহবধূর রূপটি মুছে যায়নি। সে পতিপরায়না নারী। স্বামী কালকেতু শিকার করে গৃহে ফিরলে তাঁর চরণ জল দিয়ে ধুয়ে দেয়। কবির কথায় —

''আপনার গৃহে বীর দিল দরশন।
ফুল্লরা আসিয়া বীরের ধোয়াইল চরণ।।''[১৭৬]

তাদের অভাবের সংসারে একটি গোধিকাই রন্ধনের সম্বল। গোধিকা শিকারে ক্লান্ত স্বামী কালকেতু স্ত্রী ফুল্লরাকে তা দিয়ে স্নানে যায়। কিন্তু ফুল্লরা গৃহ থেকে বেরিয়ে কোন গোধিকা না দেখতে পেয়ে দুশ্চিন্তায় তার হৃদয় ভরে ওঠে। ক্ষুধার্ত কালকেতু স্নান করে খাবার না পেলে তাকে প্রহার করতে

বিবেচনা করবে না। কারণ ফুল্লরা তার স্বামী সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত যে, সে যুক্তি বুদ্ধির অতীত। তাই গোধিকা স্থানে ষোড়শী নারীকে দেখে মনে মনে ভীত হয়ে বলেছে —

''আমার প্রভু মূঢ়মতি নাহি তার সুবুদ্ধি
দৈব্বে আজি মারিবে কিলিয়া।।''[১৭৭]

তার মনে হয়েছে গৃহের আগন্তুক ষোড়শী নারীই গোধিকা ছেড়ে দিয়েছে। সেই ষোড়শী নারীকে সতীন ভেবে যে দুশ্চিন্তা তার তুলনায় ফুল্লরার মনে সংসারের অভাব, অনটন ও স্বামী নির্যাতনই বড় হয়ে উঠেছে। এইরূপ সংসারে দেবীকে দেখে ফুল্লরা তাকে বলে —

''ওহে দেবী সুন্দরী রামা ত্রিভুবনে অনুপামা
কেনে আইলা বীরের বাসরে।
জীবনের না পাইবে সুখ মরণের অধিক দুখ
বড় দুখ অক্ষটির ঘরে।।''[১৭৮]

এই অবস্থায় ফুল্লরা নিরুপায়। সে সঠিক উপায় নিরসনের জন্য দৌড়ে অভিজ্ঞ বৃদ্ধা মাসীর কাছে উপস্থিত হয়। কারণ সেই এই কঠিন অবস্থায় সঠিক উত্তরণের পথের সন্ধান দিতে পারে। ফুল্লরা তার মতানুসারে কালকেতুর অনুপস্থিতিতে ষোড়শী কন্যাকে ঝগড়া করে বিদায় করতে উদ্ধত হয়েছে। তবে মানিক দত্তের ফুল্লরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর ফুল্লরার মত তৎক্ষণাৎ সতীনকে বিতাড়িত করার জন্য পদক্ষেপ নেয় না। তার কাছে অভাব, অনটন ও নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতির হীন অবস্থা বড় হয়ে উঠেছে। ব্যাধিনী হয়ে মাংস বিক্রি করা কতটা সমাজের কাছে আত্মমর্যাদা নাশক ও লজ্জার কাজ সেটাই ফুল্লরা দেবীকে বলে। কিন্তু এসকল কথায় দেবী অটল। তখন ফুল্লরা নতুন কৌশল ফাঁদে। ফুল্লরা তার রূপের পুঙ্ক্ষাণুপঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করে এবং কুল ঘাতিনীর সামাজিক ভয় দেখায়। আবার দেবীকে তাদের দাম্পত্য জীবনে অনুপ্রবেশ থেকে নিরত রাখতে সংসারের অন্নাভাবের ভয় দেখায় এবং স্বামী কালকেতুকে দেবীর সম্মুখে দুশ্চরিত্র রূপে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু সমস্ত কিছু শুনেও দেবী চলে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করে। দেবী ফুল্লরাকে বলেছে যে, সে পুত্রের কারণে এখানে এসেছে। ফুল্লরার স্বামী কালকেতুই দেবীকে শর্ত করে গৃহে এনেছে। গৃহে দেবী তার দুই পুত্রকে নিয়ে আনন্দে থাকবে এবং ফুল্লরা তার দাসীবৃত্তি করবে। তাদের খাবার পর উচ্ছিষ্টাংশ সে পাবে। এমনকি, গরমে তাকে বাতাস করে দিবে। একথা শুনে তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। এবং দেবী তার দাম্পত্য জীবনের অক্ষমতা ও দুর্বলতায় আঘাত করে। দাম্পত্য জীবনে নারীর সন্তানহীনতা কতটা দুঃখের তা ফুল্লরার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। ফুল্লরা তাকে বলেছে —

''আটকুড়ার পাতিলকে দোষ না দিহ সুন্দরি।।

এত বলি গালি পাড়ে জত মনে আইসে।''[১৭৯]

অভাবের দাম্পত্য জীবনে একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ স্বামী কালকেতুকে হারানোর আশঙ্কায় ফুল্লরা নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। গ্রাম্য গৃহবধূদের মত দেবীর সঙ্গে অসংযমী ও অশ্লীল আচরণ করেছে। তার ফলে দেবী তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ব্যতিব্যস্ত হলে সে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে। এইরূপ অবস্থায় ফুল্লরা তার 'বারমাস্যা' বা বারমাসের দুঃখ কাহিনী বলতে শুরু করে। মানিক দত্তের ফুল্লরার বারমাস্যার দুঃখ সমস্তটাই কালকেতু কেন্দ্রিক। স্বামীর জন্য তাকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয় তার প্রমাণ ফুল্লরার বারমাস্যা। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সঙ্গত কারণেই বলেছেন — ''নারীর নিজস্ব স্মৃতির করুণরসে ঝঙ্কৃত, দুঃখময় জীবন অনুভব আশঙ্কায় আতঙ্কিত, মর্মরদাহের উষ্মতা নির্জন সন্ধ্যায় একমাত্র বীণাঝংকারের করুণতা, সবুজ অন্তরের সজীবতা এতে রূপায়িত।''[১৮০] মানিক দত্তের ফুল্লরা তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাম্পত্য জীবনের অবহেলার দিকটি রূপায়ণের সাক্ষ্য। তবে তার মধ্যে দাম্পত্য জীবনে সতীনের অনুপ্রবেশে স্বতঃস্ফূর্ত আশঙ্কার অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় না।

এরপর দেবী চণ্ডী কালকেতুকে ধন দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফুল্লরা কালকেতুকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এই ধনের কারণে দেবী কর্তৃক বিড়ম্বনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেবী তার অঙ্গুরীর দাম সাতকোটি টাকা বললে সে মুখ বাঁকা করে। তার মত নিম্ন শ্রেণীর ব্যাধ রমণীর কাছে অঙ্গুরীর মূল্য সত্যিই অজ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেবী কর্তৃক সাত ঘড়া ধন প্রাপ্ত হয়ে ফুল্লরার লোভ জাগ্রত হয়। এবং দেবী চণ্ডীকে বিদায় দিতে অসম্মতির চূড়ান্ত প্রকাশ করে। এমনকি দেবী সম্পর্কে তার পূর্ব আচরণের জন্য লজ্জা বোধ করেছে। তার কাছে প্রাণের তুলনায় ধনদাত্রী দেবীর মূল্য তার জীবনের অধিক। তার ভাবনার পরিবর্তন কবি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন —

''হেট মুণ্ডে কথা কহে ফুলরা সুন্দরী
প্রাণ চাহ তাহা দেই বিদায় দিতে নারি।।''[১৮১]

দেবী সম্পর্কে ভাবনার পরিবর্তন তাকে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ব্যাধিনী নারী রূপে জীবন্ত করে তুলেছে। মানিক দত্তের ফুল্লরার কাছে সতীন সমস্যার তুলনায় তার অর্থের প্রতি লোভটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অতঃপর কালকেতু গুজরাট রাজ্যের অধিকর্তা এবং তার স্ত্রী ফুল্লরা তার অধিকর্ত্রী হয়। তারা অন্দরমহলে পাশা খেলে। কিন্তু তাদের এই সুখের দাম্পত্য জীবনে পুনরায় বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসে। কলিঙ্গ রাজের দ্বারা আক্রান্ত কালকেতু সঙ্কটাপন্ন দেখে সে অনাথ হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। তার জীবন ও জগতের উপর অগাধ মায়া। সে এই মানব জন্মকে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাশ করতে অনিচ্ছুক। এই অবস্থায় ফুল্লরার জীবনে উভয়

সঙ্কট। তার ভাবনাও দ্বিধান্বিত। একবার তার মনে হয়েছে কলিঙ্গ রাজের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভেট নিয়ে উপস্থিত হতে। আবার কখন কালকেতুকে পলায়ণপর হতে বলেছে। সে তার স্বামীকে বিপদের মুখে উত্তরণের সাহস যোগায়নি। বরং তার মনকে এই সঙ্কটাবস্থায় দুর্বল করেছে। সে স্বামী কালকেতুকে বলেছে —

''উহার পাইক সকল অস্ত্র ধরে।।
রাজাকে ভেটিতে চল নহে পালাও
ফুলুরার বচনে।।''[১৮২]

গুজরাট অধিকর্ত্রী ফুল্লরার মধ্যে এই দুর্বল চিত্তের প্রকাশ বেমানান বলে মনে হয়। লোভ জনিত কারণে স্বামীর সংঙ্কটাপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে নিম্নশ্রেণীর বাঙালী রমণীর মতো ফুল্লরা আত্মধিক্কারে ভেঙে পড়ে। কারণ স্বামী কালকেতু ছাড়া তার জীবন অভিভাবকহীন। নববিবাহিত সুন্দর যুবতী নারী ফুল্লরার জীবন সমাজে অসহায় ও আশ্রয়হীন। তাই সে স্বামীকে বলে —

''ধনের কারণে প্রভু হারাইলে প্রাণে।
য়নাথিনী করিলেক ফুলুরা অভাগিনে।।
পিতা কুলে শশুর কুলে কেহু নাহি আমারে।
এই রূপ জৌবন লইয়া জাব কথাকারে।।''[১৮৩]

মানিক দত্তের ফুল্লরা এই স্থানে অত্যন্ত দুর্বল, ভীতু ও নিরূপায় চরিত্র। ফুল্লরা স্বামীর প্রতি চিন্তার তুলনায় নিজের আত্মরক্ষার চিন্তায় বেশি ব্যাকুল। নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী ব্যাধ নারীর সমাজে আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখা কঠিন। অন্যদিকে, তার রয়েছে একমাত্র অভিভাবক স্বামীকে হারানোর দুঃশ্চিন্তা। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে নারীর অভিভাবকত্বহীন অবস্থায় শ্লীলতাহানীর আভাসও পাওয়া যায়।

নিম্নশ্রেণীর ব্যাধরমণী ফুল্লরার সহজ, সরল, নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সে ভাঁড়ু দত্তের চতুরতা বুঝতে পারেনি। যুদ্ধে কলিঙ্গরাজের জয় হয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজের হয়ে আত্মগোপনকারী কালকেতুতে গুজরাট রাজদরবারে ধরতে এসেছে। ফুল্লরা তার স্বল্প বুদ্ধির দ্বারা ভাঁড়ু দত্তের গোপন অভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পারেনি। ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরার সম্মুখে অত্যন্ত তোষামদের সঙ্গে পুনরায় কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙবার এবং কলিঙ্গ রাজ কর্তৃক খাজনা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি শোনায়। তাতে ফুল্লরার মন সহজেই টলে। অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে ফুল্লরা ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্তে পা দেয়। সে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্ত বিচার করেনি। সে দুর্বল চিত্তের ব্যাধ রমণী। তাই সে আত্মগোপনকারী কালকেতুকে দেখিয়ে দিয়েছে।

''সুবুদ্ধি ছিল ফুলরার কুবুদ্ধি পাইল।

ঘরে ছিল কালকেতু দেখাইয়া দিল।।''[১৮৪]

বন্দী স্বামীর জন্য ফুল্লরা ব্যাকুল চিত্তে অনাথিনী নারীর ন্যায় গৃহ-দ্বারে বসে থাকে। সে ব্রাহ্মণের পা ধরে কাতর আকূতি জানায়। সামাজিক দিক থেকে নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ ফুল্লরা অনুভব করেছিল যে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণই তার স্বামী উদ্ধারের একমাত্র পন্থা। কিন্তু ফুল্লরার তাকে আর প্রয়োজন হয়নি। দেবী কর্তৃক তার স্বামী বন্দী মুক্ত হয়। তবে ফুল্লরা চরিত্রের দ্বারা রাজদরবারে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর আধিপত্যের স্পষ্ট নিদর্শন মেলে।

শেষে ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে নারীকাঙ্ক্ষিত দিকটি ফুটে উঠেছে। সে সন্তান আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। তার জন্য রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে দেবী চণ্ডীর পূজায় দীর্ঘদিন ব্যস্ত থেকেছে। সে দেবী চণ্ডীর ভক্ত। ফুল্লরা তাকে উপবাস থেকে সহৃদয়ে বনফুল দিয়ে পূজা করে। কবি তার বর্ণনা করেছেন এইভাবে —

''ফুলরা অনাহার পূজা করে কতকাল
বন পুষ্প তোলে নিরন্তর।''[১৮৫]

ফুল্লরা কর্তৃক পূজিত দেবী চণ্ডীকে এখানে বনদেবী বলে মনে হয়। নিম্নশ্রেণীর নারী ফুল্লরার সঙ্গে বনদেবী চণ্ডীর সম্পর্ক স্বাভাবিক। মানিক দত্তের ফুল্লরা জীবনাভিজ্ঞতায় পূর্ণ। বাঙালী বধূর ন্যায় সে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন নারী রূপে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কিছু তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকলেও ব্যাধ রমণী হিসাবে তার চরিত্রটি জীবন্ত।

অন্যদিকে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নানা স্থানে অন্ত্যজ মানুষের জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কবি মানিক দত্ত প্রকট করে তুলেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে অন্ত্যজ ব্যাধদের সঙ্গে মহাজন এবং অন্য ধরনের উচ্চবিত্ত মানুষের বিষয়টিও 'ব্যাধ খণ্ডে' এসেছে। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ জীবন তুলে ধরতে অবকাশ পাওয়া যায়। দুইয়ের দ্বন্দ্ব প্রকটে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এধরনের অপ্রধান পুরুষ চরিত্র **ভাঁড়ু দত্ত**। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাঁড়ু দত্ত উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বাংলা মঙ্গলকাব্যে তার তুলনা মেলা ভার। তার চরিত্রের সম্বন্ধে সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন — ''গুজরাটে নবাগত অধিবাসীদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তেরই সুস্পষ্ট এবং কাহিনীর পক্ষে আবশ্যিক ভূমিকা। ... আধুনিক পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড চরিত্র আর নাই।''[১৮৬] ভাঁড়ু দত্ত অনেকটা ভিলেন (Villan) বা খল চরিত্র। সে চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্র হয়েও আধুনিক উপন্যাসের চরিত্রের মতো জীবন্ত।

মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজ্যের মণ্ডলদের মধ্যে প্রধান। সে শিবের ভক্ত। দেবী চণ্ডীর গুজরাট নগর পত্তন প্রসঙ্গে কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙনের পরিকল্পনার মুহূর্তে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রের

কাব্যে আগমন। কলিঙ্গের চারজন মণ্ডল দেবীর মন্ত্রণায় কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙবার পরিকল্পনা করলে ভাঁড়ু দত্ত তাদের বাধা দেয়। এই থেকে সে চণ্ডীর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় চণ্ডীর সঙ্গে ভাঁড়ু দত্তের লড়াই। ভাঁড়ু দত্ত দেবীর বিপরীত পন্থী চরিত্র। তাকে শায়েস্তা করতে দেবীকে বার বার ইন্দ্রের সভায় যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে বন্যার দ্বারা হেনস্থা করা হয়। তবুও তার নিজের শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিপরীত পক্ষের ইন্দ্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। শিবের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস। তাই সে মৃত্যুকেও ভয় করে না।

''পিড়াতে বসিয়া ভাড়ু মালসাট মারে।
কি করিতে পারে ইন্দ্র পুরন্দরে।।
শিবকে পূজিয়া আমি হৈয়াছি য়মর।''[১৮৭]

ভাঁড়ু যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই দিকেই জল থই থই করছে। ঘর-বাড়ি সমস্ত ভেসে গেলেও সে চণ্ডীর কাছে সহজে হার মানতে চায় না। সে বলেছে — ''তব না পূজিব দেবী সর্ব্বমঙ্গ ল।।''[১৮৮] শেষ পর্যন্ত চণ্ডীকে সে বাধ্য করেছে গঙ্গার কাছে যেতে। দেবী চণ্ডী গঙ্গার কাছে অপমানিত হয়ে ডাক-ডেউয়ের কাছে উপনীত হতে হয়েছে। তাদের দ্বারা কলিঙ্গে পুনরায় ব্যাপক বন্যা হয়েছে। সেই বন্যায় কলিঙ্গের ছত্রিশ জাতি তাদের বাসভূমি ছেড়ে পলায়নপর হয়। কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত তাদের লক্ষ্য করে একাই কলিঙ্গের মণ্ডল হিসাবে থাকতে চেয়েছে। সে পরাক্রমশালী। বিপদে নিজেকে সঁপে দেয়নি। প্রাণপণ বিরূপ অবস্থার সঙ্গে লড়ে চলেছে। সে উঁচু মঞ্চ তৈরী করে তার উপর পিঁড়িতে বসে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। সেখানেও বন্যা অনুপ্রবেশ করলে ভাঁড়ু দত্ত গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু দেবীর চক্রান্তে গৃহের দেওয়াল ইঁদুর কর্তৃক কাটা হয়। অতঃপর গৃহের সকল পরিজনকে বাঁচানোর জন্য সে মাটির 'উগার' বা উঁচু মাচা তৈরী করে। কবি তার এই জীবন যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

''মাটি ভাঙ্গিয়া বেটা উগার বান্ধিল।
সগোষ্ঠি সহিতে ভাড়ু উগারে চড়িল।।''[১৮৯]

ভাঁড়ু দত্ত কেবল নিজের আত্মরক্ষার কথা ভাবেনি। সঙ্কট কালে সে স্বজনের কথাও ভুলে যায়নি। স্বজন ভাবনায় ভাঁড়ু দেবীর কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। সুকুমার সেন মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন — ''ভাঁড়ু দত্ত শিবের উপাসক, তাই দুর্গা তাহার উপর বিরূপ। কলিঙ্গ বন্যার বর্ণনায় এই বিরূপতার একটু ইঙ্গিত আছে। মানিকদত্তের রচনায় ভাঁড়ু দত্ত শক্তিমান পুরুষ, একেবারে ভাঁড় নয়।''[১৯০]

এরপর ভাঁড়ু দত্তের গুজরাট নগরে আগমন কলিঙ্গের সকল প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে। কালকেতুর সামনে নিজেকে সকলের প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশ করেছে। কিন্তু কালকেতুকে তার রাজা বলতে

আত্মমর্যাদায় বেঁধেছে। তার জাত্যাভিমান প্রবল। সে জাতিতে কায়স্থ। কালকেতু নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ হয়েও গুজরাট নগরের রাজা। নিম্নশ্রেণীর কালকেতুকে তার রাজা বলে সম্বোধন করতে দ্বিধা রয়েছে। সে কালকেতুকে বলেছে —

''বসত করিতে আনিলাম জত প্রজাগণ।।
আমি বসাইয়া দিব প্রজা লোকের তরে।
সুরথ রাজা বান্ধিয়া লবে তারে।।''[১৯১]

তার কথায় রাজা অত্যন্ত খুশি হয়। মানিক দত্তের ভাঁড়ু শঠ, মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর চরিত্র। তার রয়েছে কৌশলী বুদ্ধি ও বাক্যালাপের শঠতা। ভাঁড়ু দত্ত জানে কীভাবে রাজা কালকেতুর মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। সে কালকেতুর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা সুরথের নিন্দা করে এবং তার সামনে বলে যে, যারা কলিঙ্গ রাজের বলবিক্রমের প্রশংসা করবে তাদের বন্দী করা হবে। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর বলিষ্ঠতার কথা সরাসরি না বলে কলিঙ্গ রাজের দুর্বলতার কথা প্রসঙ্গে আভাসে তা প্রকাশ করেছে। এখানে ভাঁড়ু কালকেতুর মনোগ্রাহী। তাই সে সহজেই কালকেতুর ভালোলাগার বিষয় ধরতে পেরেছে। তাকে রাজ সভায় সম্মাননীয় আসন এবং হংসরাজ ঘোড়া দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

''এমত শুনিয়া রাজা খুসিত অন্তর।
নফরে আনিয়া দিল গাণ্ডিব য়াসন।।
তা সন্ধানে মারি তীর ভেদিল পয়ান।
প্রত্যএ না গেল দত্ত ভাড়ুয়া নাবড়।।''[১৯২]

ভাঁড়ু দত্ত একটি সম্মাননীয় পদেরই অভিলাষী ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়লে তা লক্ষ্যভেদ করে। তাই তার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর সে কালকেতুর কাছ থেকে নগরে তোলা আদায় করার অনুমতি চায়। এবং নিমিষে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা তার কাছে রাজকার্যের অংশ। একথা কালকেতুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতে সে কালকেতুর অনুমতি লাভ করে। কার্যত সে বিপরীত করে। সে নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজের গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বে অভিজাত ভাব বজায় রেখেছে — হোক না তার এক হাতে ভাঙ্গা দোয়াত এবং মুড়া কলম। তবু সে সঙ্গে নিয়েছে সাত পুত্রকে।

''সাত পুত্র লইল ভাণ্ডারি করিয়া।
ভাঙ্গা দোয়াত লইল কমরে করিয়া।।
মুড়া কলম লইল কর্নতে গুজিয়া।
বজারে প্রবেশ হৈল জমিদার হৈয়া।।''[১৯৩]

সে রাজার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থী। কিন্তু বাইরে সে জমিদারের আবেষ্টনে নিজেকে পরিবৃত করেছে। তার মধ্যে প্রকৃত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার মানসিক দৃঢ়তা রয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক পরিচয় তার চরিত্রে বিরল ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। এই মানসিকতা থেকেই তার বাজারে প্রবেশ। বাজারে প্রবেশ করে সকালের কাছ থেকে জোর করে তোলা তুলেছে। সে তার সামাজিক ও জাতিগত অবস্থানের পরিচয় প্রবল অভাবেও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাতে ভাঁড়ুকে এক অসামাজিক, রূঢ় ও রুক্ষ্ম চরিত্র বলে মনে হয়।

ভাঁড়ুর অত্যাচারে জর্জরিত প্রজা সকল কালকেতুর কাছে কড়া মন্তব্যে নালিশ জানায়। তাই কালকেতু তাকে চড় মেরে সকলের সামনে অপমান করে। তখন মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত ভিলেন চরিত্রের মতো রাজা কালকেতুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। সে দুষ্টু প্রকৃতির লোক। সেই তথ্য সকলে জানে। এখন তার পরিচয় পাবে কালকেতু। সে এতটাই ক্ষমতার অধিকারী যে, তার আদেশে বাইশ জন রাজা কর্তৃক কালকেতুর রাজ্য লুণ্ঠন করবে এবং তাকে কারাগারে বন্দী করিয়ে ছাড়বে।

''চড় খাইয়া ভাড়ু দত্ত মালসাট মারে
খুড়া আমার নাম ভাড়ুয়া নাবড়।।
আমার নাম ভাড়ু দত্ত সভে জানে আমার তত্ত্ব
খুড়া তোমার বস্ত্র দুইখানি কানি।
* * *
তবে ভাড়ু দত্ত আমি খ্যাতি রাখিব।
আপন হুকুমে বাইশ বাজার লুটিব।।
সভার মধ্যে ভাড়ু কএ কুবাক্য বচন।
ধুলিয়া কারাগারে তোকে করাব বন্ধন।।''[১৯৪]

ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর অপমান সহ্য করতে পারেনি। তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। কালকেতুর বিরুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারই প্রতিধ্বনি। এই ধরনের প্রাণবন্ত চরিত্র মানিক দত্তের কাব্যে আর একটিও নেই।

ভাঁড়ু দত্ত অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। কালকেতু কর্তৃক অপমানে তার প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়। সে কলিঙ্গ রাজ সুরথকে কালকেতুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কৌশলে যুদ্ধে উত্তেজিত করে। সেই যুদ্ধে কালকেতু আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করে। সেই কালকেতুকেও গোপন স্থান থেকে বিচক্ষণ জহুরীর মত বের করে আনে। মানিক দত্তের ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরাকে বলে —

''খুড়ার প্রসাদে করিলাম অনেক ঠাকুরালী।

সুরথ রাজা তোমার তরে পাঠাইল ইরসান।।
বিনএ ভাবে ভাড়ু দত্ত করে নিবেদন।
খুড়ার সনে মোর খুড়ী করাঅ দরশন।।
সুবুদ্ধি ছিল ফুলুরার কুবুদ্ধি পাইল।
ঘরে ছিল কালকেতু দেখাইয়া দিল।।''[১৯৫]

ভাঁড়ু র প্রতিশোধস্পৃহাতেই কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতু কারাগারে বন্দী হয়। যদিও দেবীর কৃপায় সে মুক্তি পায়। মুক্তি পেয়ে কালকেতু সিংহাসনে বসেই ভাঁড়ুকে ঘোল ঢেলে মাথা অর্ধেক নেড়া করে যারপরনাই অপমান করে। তাতে নগরের সকল প্রজা চারিদিক থেকে তাকে উপহাস করে করতালি দিয়েছে। এই অপমানে তার বড় ছেলেকে কাঁদতে দেখলেও তার লোভ নিবৃত্তি হয় না। সে মাথায় ঢালা ঘোল খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার শুভাকাঙ্ক্ষিদের কাছে ভাঁড়ু নিজের অপমান ঢাকবার জন্য সকলকে বলে — ''বারানসী তির্থভূমি ভ্রমিলো।''[১৯৬] এমনকি ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে আঁটকুড়া অপবাদ দেয়। সেই অপবাদ ঢাকবার জন্য কালকেতুর সন্তান লাভের আশা জাগ্রত হয় এবং রাজকার্য পরিত্যাগ করে দেবীর ব্রতে মনোগ্রাহী হয়। তাই কাহিনী ও চরিত্রের মনোভাবনা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই চরিত্রের গুরুত্ব রয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''তবে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা ইহাতে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; তাহাকে নিছক 'ভিলেন' বলিয়াও মনে হয় না।''[১৯৭] সে জীবন্ত খল চরিত্র। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এরূপ চরিত্র দুর্লক্ষণীয়।

তবে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে **পুরাই দত্ত** চরিত্রটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কালকেতু দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরী নিয়ে তার বাড়ি যায়। সেখানেই তার প্রথম আবির্ভাব। আর মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু যায় মুরারী শীল নামে এক বাণ্যার গৃহে। সে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও চতুর। কিন্তু মানিক দত্তের পুরাই দত্ত নিষ্প্রভ চরিত্র। তার আবির্ভাব ও অবস্থান কাব্যে খুবই সীমিত সময়ের জন্য। এই সীমিত সময় পর্বে চরিত্রটি কীভাবে অঙ্কিত হয়েছে দেখে নেওয়া যাক্।

পুরাই দত্ত মূল্যবান দ্রব্য সনাক্তকরণ করতে পাকা জহুরী। কালকেতু দেবীর অঙ্গুরী নিয়ে গৃহস্থ মণ্ডলের কাছে যায় যে এর মূল্য বুঝতে না পেরে তাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু পুরাই দত্ত তার তুলনায় বুদ্ধিমান বানিয়া। সে কঙ্কণে ধর্ম নিরঞ্জনের নাম দেখে তা শিরে ঠেকায় এবং তা গোলার উপর রাখে।

''কঙ্কনে দেখিয়া ছিল ধর্ম নিরঞ্জন।
কঙ্কন লইয়া শীরে করিল বন্দন।।
গোলার উপর কঙ্কন থুইলেন বাণিয়া।

ভার ভরি খন্‌তা কোদাইল দিলেন আনিয়া।।''[১৯৮]

তার চরিত্রে যেমন একদিকে বিচক্ষণতার পরিচয় আছে, তেমনি তার সঙ্গে মিলে মিশে আছে তার ধর্ম বিশ্বাস। তাতে করে চরিত্রটি ধার্মিক বাণিয়ার পরিচয় প্রদান করে।

এ ধরনের অপর একটি অপ্রধান চরিত্র হল কলিঙ্গ রাজা **সুরথ**। সে ব্যাধ খণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। পূর্বে তার নিদর্শন পাই মার্কণ্ডেয়পুরাণে। সেখানে সে চন্দ্রবংশীয় রাজা এবং তার পিতা চৈত্র। চৈত্র চন্দ্রের পৌত্র। মার্কণ্ডেরপুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি তার সম্বন্ধে বলেছে —

''ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।

*　　*　　*

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মুর্ত্তিংমহীময়ীম।

অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্প-ধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।।'' ৭[১৯৯]

অর্থাৎ, '' অতিশয় মমতা এবং রাজ্যাপহরণ জন্য নিতান্ত দুঃখিত সেই নরাধিপ সুরথ, ... বৈশ্য এবং রাজা সেই পুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ এবং হোমাদি দ্বারা পূজা করিলেন।''[১৯৯] কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজা সুরথ প্রথমত শৈব ভক্ত। পরে তার শক্তি দেবীর প্রতি আস্থা প্রকাশ পায়। পুরাণের রাজা সুরথের সঙ্গে কালকেতু নামে কোন ব্যাধ চরিত্রের লড়াই বিবৃত হয়নি। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর সঙ্গে তার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শৈব শাক্ত ও শৈব ধর্মের বিরোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তার কলিঙ্গ রাজ্যে চণ্ডীর দোহরা নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই দ্বন্দ্বের সূচনা। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারক গায়েন মানিক দত্তের দ্বারা। তার গানে কলিঙ্গবাসী মোহিত ও আপ্লুত হয়ে রাজ দরবারে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কোতাল মুখে সেই সংবাদ শুনে সে কুপিত হয়। গায়েন মানিক দত্তকে ধরে আনা হয়। তাকে সুরথ বলে —

''রাজা বোলে মিথ্যাগীতে লোকের গেল কাজ।

মিথ্যা গায়ন কর বেটা কলিঙ্গের মাজ।।

কুনদেব রূপ ধরে কেমন মূরতি।

কেমন দেখিলা তার স্বরূপ আকৃতি।।''[২০০]

তার ফলে দেবীর ভক্ত মানিক দত্তকে বন্দী করা হয়। দেবী চণ্ডী তাকে স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে তার প্রচণ্ড মূর্তি দেখে মানিক দত্তকে রাজা সুরথ অত্যন্ত সমাদর এবং বিনয়ের সঙ্গে তাকে মুক্ত করে। কলিঙ্গ ভেঙ্গে দেবী চণ্ডী গুজরাট নগর পত্তন করলে রাজা সুরথের প্রজাবৎসল স্বরূপটি প্রকাশ পায়। নিজ রাজ্য ভাঙ্গনে সে শোকাহত ও বিধ্বস্ত। নিরপরাধ ও ভাগ্যের কাছে অসহায় কলিঙ্গ রাজ সুরথ। তার কাছে কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গনের শোক পুত্র হারানোর তুলনায় বেশি মর্মাহত। স্বীয়

রাজ্য হারানোর প্রতিশোধ নিতে তার দেবী চণ্ডীর মুখাপ্রেক্ষি হতে দেখা যায়। এভাবে পুরাণের রাজা সুরথকে মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নতুন মাত্রা দান করেছেন।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি নিজেই চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারক। তিনি গায়েন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল **রঘু** ও **রাঘব**। তাদের নামে রামভক্তিবাদের একটা আভাস পাওয়া যায়। তারাও মূলত গায়েন। নিঃস্বার্থ ভাবে দেবী চণ্ডীর ভক্তিতে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করেছিল। তাদের গানে কলিঙ্গবাসীরা মোহিত। তাদের গানের আকর্ষণে সকল কলিঙ্গপ্রজারা রাজ দরবার শূন্য করে উপস্থিত হয়।

চণ্ডীর স্বীয় পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী শিবের শিষ্য নীলাম্বরের প্রকৃত অধিকার নিয়ে উভয়ের মধ্যে লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বে উভয়ের প্রতাপ ও প্রচণ্ডতা বড় হয়ে উঠেছে। সেই প্রচণ্ডতার প্রকাশ স্বরূপ **ধর্মকেতু** ও **নিশানকেতু**। উভয়ের লড়াই জনিত শিবের ঘর্ম থেকে ধর্মকেতু ও নিশানকেতুর জন্ম। এই দুই ব্যাধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপ্রধান পুরুষ চরিত্র। তারা শিবের অনুগত এবং দেবী চণ্ডীর প্রতিস্পর্ধী চরিত্র। ধর্মকেতুর স্ত্রী নিদয়া এবং তার পুত্র নীলাম্বর। আর নিশানকেতুর স্ত্রী কমলা এবং তার কন্যা ফুল্লরা। ধর্মকেতু ও নিশানকেতু উভয়ে শিকারজীবী। ধর্মকেতু তার পুত্রের সঙ্গে নিশানকেতুর কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করে পিতার কর্তব্যপালন করে। এরপর তারা চণ্ডীর ছলনার শিকার হয়। ফলে, উভয় উভয়কে পশুবৎ দেখে এবং পরস্পর পরস্পরের বাণে মারা যায়। এভাবে তাঁদেরকে নিয়ে ব্যাধ খণ্ডে একটি সম্পূর্ণ কাহিনীবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, কালকেতুর গার্হস্থ্য জীবনে তার শিকর যাত্রা, ব্যাধ জীবিকা ও তার মানসিকতা উন্মোচনে **বেনিয়ার** চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। বেনিয়া চরিত্রটিকে কোন নামে চিহ্নিত করা হয়নি। জীবিকাই তার ব্যক্তিনামের পরিচায়ক। সে বন থেকে আনা আগর চন্দন ও কাঠ বাজারে বিক্রি করে। কালকেতুর সঙ্গে বনে তার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কালকেতু তার প্রতি তাচ্ছিল্য মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু তার মুখে প্রতিদিন দেড়জুড়ি কড়ি উপার্জনের কথা শুনে তাকে কালকেতু বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে কালকেতু মিতার সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি, পথে কালকেতু তার আগে গিয়ে তাকে পিছনে নিয়েছে। এখানে কালকেতু চরিত্রের দ্বৈতসত্তার প্রকাশে এই বানিয়া চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে হয়।

ব্যাধ খণ্ডে কলিঙ্গরাজ সুরথের সঙ্গে গুজরাটরাজ কালকেতুর যুদ্ধটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ। সেই যুদ্ধে রাজা সুরথের চারজন সর্দারের কথা উল্লেখ রয়েছে। তারা হল **রামানন্দ, দেবানন্দ, শোভানন্দ, কালডণ্ডা**। সামাজিক মর্যাদায় তারা উচ্চবর্ণের। এরা সকলে রাজার আবাদি জমি ভোগীদার ছিল। এই আবাদি জমি তাদের মাহিনা স্বরূপ। সৈন্যদের মধ্যে রামানন্দ

যুদ্ধে ব্যাপক পরাক্রমী। সে কালকেতুর রাজদরবারের পূর্বদ্বার আক্রমণ করে। সেই দ্বারে কালকেতুর 'বাঙ্গালি নস্কর' ছিল। বাঙ্গালী শব্দটির দ্বারা মধ্যযুগে নিম্নশ্রেণীর জাতিকে বোঝান হত। রামানন্দের আক্রমণে কালকেতুর এই বাঙ্গালী নস্কর থানা ছেড়ে পলায়ন করে। উত্তর দ্বারের দেবানন্দও রামানন্দের ন্যায় পরাক্রমী যোদ্ধা। পশ্চিমদ্বার আক্রমণ করে শুভানন্দ। শোভানন্দ বুদ্ধিতে বৃহঃস্পতির সমতুল্য। কালকেতুকে মারতে সে একশত হাতিসহ সৈন্যদের নিয়ে আসে। অন্যদিকে, দক্ষিণদ্বারের কালডণ্ডা নামে কোতাল অতি ঘোরতর। সে একসঙ্গে বত্রিশ জনের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম এবং তার দেহ পর্বততুল্য। চক্ষু তার সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় লাল। তার সঙ্গে ষাট হাজার ধনুকধারী যোদ্ধা লড়াই করে। এই অবস্থায় কালকেতুও যুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মিরাখর নামে এক কর্মচারিকে ডাকে। মিরাখর কালকেতুর আদেশে যুদ্ধ জয় করার মত ঘোড়া এনে দেয়। যুদ্ধে সর্বপ্রথম রামানন্দের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়। তার মধ্যে উচ্চবর্ণের আত্মঅহমিকা প্রবল ছিল। তাই কালকেতুকে তার নিম্নবর্ণের ব্যাধ পরিচয় যুদ্ধাঙ্গনে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার সমাজ বহির্ভূত ও নিম্নবর্ণের হীনমন্যতায় আঘাত করে। তাতেই কালকেতুর সঙ্গে তার যুদ্ধের সূচনা হয়। সে পরাজিত হলে কালকেতু পূর্বদ্বারে দেবানন্দের সম্মুখীন হয়। দেবানন্দও কালকেতুকে তার অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিচয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। সে কালকেতুকে বলে —

''একদ্বার জিনি বেটা দেখাইস শামনা।
আমার হস্তে আজি তোমার ভাঙ্গিব বীরপনা।।''[২০১]

শোভানন্দ ও কালডণ্ডা উভয়ে একই পরিচয় প্রদান করে। যদিও তারা কালকেতুর কাছে পরাজিত হয়। বস্তুত, তাদের মধ্যে সামাজিক উচ্চ-নিম্নের ভেদাভেদে লড়াই বড় হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, ব্যাধ খণ্ডের দুই জন অপ্রধান নারী চরিত্র **নিদয়া** ও **কমলা**। চণ্ডীর স্বীয় প্রচণ্ড শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব রয়েছে। শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চণ্ডী তার পরিধেয় বস্ত্রের নিষিক্ত জল থেকে এই দুই নারী চরিত্রের জন্ম। কবির কথায় —

''পহ্রিবার বস্ত্র দুর্গা ধরিয়া চিপিল।
নিদয়া কমলা নামে ব্যাধিনী জন্মিল।।''[২০২]

নিদয়া ও কমলা ব্যাধ গৃহবধূ। নিদয়ার স্বামী ধর্মকেতু এবং কমলার স্বামী নিশানকেতু। উভয়ে সন্তানবতী। দেবী চণ্ডী কর্তৃক নিদয়া কালকেতুকে এবং দয়াবতী ফুল্লরাকে সন্তান হিসাবে লাভ করে। লক্ষণীয়, কমলা নামটির স্থানে হঠাৎ **দয়াবতী** নামটি প্রয়োগ আশ্চর্যের। তারা পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হয়। কবির কথায় —

''ভাগ্যবতি দুইটা শ্রিয়া বার্ত্তা পাইল
সেহ মৃতা হৈল দুইজন।।''[২০৩]

নিম্নশ্রেণীর সমাজে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল নিদয়া ও দয়াবতী চরিত্র দুটি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ফুল্লরাকে দেবী চণ্ডীর ষোড়শীর ছদ্মবেশ ধারণ করে ছলনা করতে আসা অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। সেই অবস্থায় ফুল্লরার সতীন সন্দেহকে দৃঢ় করার জন্য **মাসিমা** চরিত্রটির আগমন। তার কোন নাম উল্লেখ নেই। সে বয়োবৃদ্ধ ও সমাজ অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক। ফুল্লরা তার সম্মুখে সতীন জনিত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। তাতে সে ফুল্লরাকে সতীন সমস্যার সম্পর্কে সচেতন হতে বলে। পুরুষ জাতীর রূপ-যৌবনের প্রতি মোহ তার অজ্ঞাত নয়। তাই সে ফুল্লরাকে কালকেতুর অনুপস্থিতিতে ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে অন্যত্র পাঠাবার জন্য বলে।

''শুনিয়া ফুলরার কথা মাসীমায়ে বলে।
দেখো দারুণ সতা আছে তোর কপালে।।
জাবত কালকেতু বীর না আইসে ঘর।
কন্দল করিয়া পঠাও দিগান্তর।।''[২০৪]

এই কথায় ফুল্লরা পরিকল্পিত ভাবে দেবীকে তাদের দাম্পত্য জীবন থেকে বিতাড়িত করার নবনব কৌশল গ্রহণ করেছে। দেবী তাদের রাজ-রাণী তৈরী করতে চাইলে ফুল্লরা পুনরায় মাসীমার দ্বারস্থ হয়। তার উপর দেবী চণ্ডীকে রাখার দায়িত্ব দিয়ে সে স্বামীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই দিক থেকে মাসীমা চরিত্রটি অবহেলার নয়।

এখন বণিক খণ্ডের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের আলোচনায় আসা যাক্।

বণিক খণ্ডে প্রধান পুরুষ চরিত্র **ধনপতি**। স্বর্গভ্রষ্ট নলকুবেরের পুত্র কর্ণমুনি মর্ত্যে ধনপতি নামে জন্মগ্রহণ করে। ধনের পতি বা অধিকারী সে। জীবিকায় সে বণিক। এই পরিচয়টি তার চরিত্রে অক্ষুন্ন রয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি। তবে তার মধ্যে জাত্যাভিমান-গৌরববোধ আমাদের বিস্মিত করে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী কর্তৃক শিবকে ছলনার প্রসঙ্গে তার আগমন। সে শৈব ও শিবের সেবক। কিন্তু শিবের সঙ্গে পাশাখেলায় চণ্ডী তাকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে জোর করে। চণ্ডীর কূট কৌশলের শিকার সে। কর্ণমুনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা এড়াতে চায়। সে প্রভুর বিপক্ষে অন্যায় ভাবে মিথ্যা সাক্ষী দিতে দ্বিধান্বিত। তার কাছে প্রভু ভক্তি ও নিষ্ঠা বড়। শেষ পর্যন্ত চণ্ডী তার জিহ্বায় সরস্বতীকে স্থাপন করে তার মুখ দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় —

''জ্ঞান হীন কর্ন্নমুনি সাক্ষী দিতে আইল।
শিব হারিল পাশা কর্ণ্ণমুণি কহিল।।''[২০৫]

এই ভাবেই সাধারণ মানুষ শক্তির সম্মুখে অসহায়, নিরীহ, অন্যের ক্রীড়ানক রূপে পরিচালিত

হত। এবং তারা তাতে ভয়ানক বিপদের শিকার হত। কর্ণমুনি এধরনের ক্ষমতার কাছে অসহায় সাধারণ মানুষের মূর্ত প্রতীক। তাই তার পরিস্থিতির কাছে পরাজিত হওয়া, ভাগ্যের দোহাই দেওয়া ও অঝোর নয়নে নীরব কান্না ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

''দুই হস্তে চক্ষে মোছে নীর।।
হায়রে কম্মের দোষ প্রভুর মনে অসন্তোষ
ভজিতে নারিলাম রাঙ্গা পাও।''[২০৬]

দেবীর মত অন্যায়কারী মানুষের বিরুদ্ধে তার বাক্‌রুদ্ধ। প্রতিবাদহীন অসহায় অন্যের স্বার্থে বলি হওয়া অগণিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি কর্ণমুনি।

অতঃপর কর্ণমুনি বণিক জয়পতির স্ত্রী উর্বশীর উদরে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। জয়পতি পুত্রের নাম রাখে ধনপতি। যৌবনে তার সঙ্গে লহনার বিবাহ হয়। কিন্তু সে নিঃসন্তান। তাই রাজা তাকে 'আঁটকুড়া' অপবাদ দেয় এবং দ্বিতীয় বিবাহ করার আদেশ দেয়। কিন্তু ধনপতির সমাজ-জ্ঞান প্রখর। সে জানে সতীন সমস্যা কতটা দুর্বিষহ। সে রাজাকে বলে —

''না বল ২ রাজা বাড়িবে জঞ্জাল।
দুইটি স্ত্রিয়ার তাপে প্রাণ জাইবে আমার।।''[২০৭]

সাময়িক সময়ের জন্য তার কাছে 'আঁটকুড়া' অপবাদের তুলনায় দাম্পত্য জীবনে একাধিক স্ত্রী জনিত জঞ্জাল ভাবনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ধনপতির চরিত্রে মধ্যযুগীয় বণিক শ্রেণীর আভিজাত্য বোধ সম্পূর্ণ বর্তেছে। সে লহনার সঙ্গে ঝগড়া করে পায়রা উড়াতে ইছানি নগরে যায়। তবে সঙ্গে নিয়েছে ওঝা জনার্দনকে।

''পায়েরা খেলিতে জায়ে সাধু ধনপতি
সঙ্গে ওঝা নড়ে জনার্দ্দন।''[২০৮]

মধ্যযুগে ধনি পুরুষদের অবসর বিনোদনের একটি ক্ষেত্র ছিল পায়রা উড়ানো। ধনপতির মধ্যে তা আমরা লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের ধনপতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''সে ধনশালী, কিন্তু বিলাসী প্রকৃতির লোক। লঘু কৌতুক ক্রীড়ায় তাহার উল্লাস, সে পরিজন সঙ্গী লইয়া পারাবত ক্রীড়ায় কালহরণ করিয়া থাকে।''[২০৯] ধনপতির পায়রা উড়ে গিয়ে বসে লক্ষপতির বাড়ির চালে। পায়রা সন্ধানে লঘুচিত্ত ব্যক্তি ধনপতির ক্রীড়াচ্ছলে খুল্লনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। খুল্লনার রূপ সৌন্দর্যে ধনপতি মোহিত ও আকর্ষিত হয়। পায়রা নেওয়ার ছলে সে তাকে একপলকে নিরীক্ষণ করে নেয়।

''সাধু ধরে বালা করে মুখ দেখিছে অহি ছলে

লয্যা পাইল খুলুনা অন্তরে।

*　　*　　*

জেইদিকে খুলুনা জায়ে　সে দিগে সাধু চায়ে
জোগী জেন বসিলেন ধিয়ানে।
বারেক দরশন পাব　　তবে গিয়া প্রাণে জীব
মদন জিনিল কামবাণে।।''[২১০]

এখানে ধনপতিকে খুল্লনার রূপ সৌন্দর্য উপভোগের তুলনায় যৌবন সম্ভোগে বেশি আকর্ষিত করে। গৃহে তার পত্নী আছে তার কথা বিস্মৃত হয়ে খুল্লনাকে বিবাহ করতে অভিলাষ জ্ঞাপন করে। সেজন্য তার নির্লজ্জের মতো আচরণ করতে বাধে না। সে খুল্লনাকে বিবাহ করার জন্য অত্যন্ত কৌশলে কাকা শ্বশুরকে প্রথমে তার উপযুক্ত কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা উত্থাপন করে। যথারীতি লক্ষপতি তার কাছে কন্যা বিবাহের বিধান চায়। তৎক্ষণাৎ সুযোগ সন্ধানী ধনপতি কাকা শ্বশুরের সামনে নিজের অবস্থা তুলে ধরে। অকপটে সে খুল্লনাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিবাহ তার কাছে বিলাসের সামগ্রী ছিল। প্রসঙ্গত আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের ধনপতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়— ''বহুবিবাহ সে যুগের ধনশালী ব্যক্তির বিলাস ছিল, বিবাহে তাহার কিছুমাত্র বাধা হইল না।''[২১১] খুল্লনার প্রতি তার আসক্তি মনের প্রকাশ পায়।

ধনপতি ভোগী। সে নিজের হৃদয় সংযমে অত্যন্ত দুর্বল। সে তার চিত্ত দুর্বলতা ঢাকবার জন্য লহনার সামনে মিথ্যা কথা বলেছে। তবে লহনার সচেতনতা ও চতুরতার সামনে সে ধরা পড়ে যায়। তখন ধনপতি তার দুর্বলতা অকপটে লহনাকে বলে —

''না বল ২ রামা লহনা বাইনানী।
মোর প্রাণ হরিয়া নইল সুন্দর খুলুনি।।''[২১২]

খুল্লনাকে বিবাহ করার পর দিন প্রভাতে সে রাজার দরবারে আসে। আত্মঅহমিকা তার প্রবল। তাই সে গায়ের 'হরিদ্র রঙ্গ' বা হলুদ রঙ নিঃশেষ হতে দেয়নি। রাজা বিক্রমকেশর তাকে আঁটকুড়া বলায় সে আত্মশ্লাঘায় দগ্ধ হতে থাকে। তারই জবান এবং অহমিকা প্রকাশ করতে সে রাজ দরবারে আসে। রাজাকে সে সম্বোধন করে সরাসরি বিছানায় বসে পড়ে। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন— ''তৎকালিক বণিকগণের বিশেষ মান্য ছিল। তাঁহারা রাজ-সভায় একাসনে বসিয়া রাজার হাতে পান পাইতেন; রাজাদের সহিত পাশা খেলা ও হাস্যপরিহাসাদিও চলিত।''[২১৩] তার মনে চাপা পড়া আঁটকূড়া অপবাদের আঘাত অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রকাশ পায়। তার অভিজাত বনিক শ্রেণীর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়। তাই রাজা তার গায়ে হলুদ রঙের কথা জিজ্ঞাসা

করতেই সে বলে—

''আটকুড় বলিয়া রাজা গালি দিলে তুমি।
তাপের তাপিত হৈয়া বিভা কৈলাঙ আমি।।''[২১৪]

কিন্তু তার দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে সে রাজাকে পূর্বে জ্ঞাত করায় নি। তাতে রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বন্দী করে। লক্ষণীয় সেকালে বিবাহ করার আগে রাজাকে জানানো বাঞ্ছনীয় নিয়ম ছিল। তা লঙ্ঘন করলে ধনপতির মত বণিককেও শাস্তি পেতে হয়। এরপর, ধনপতির গৌড়ে যাত্রাপালা। রাজা বিক্রমকেশর তাকে শারি-শুকের জন্য সুবর্ণ পিঞ্জর আনতে গৌড়ে যাবার ব্যবস্থা করে। তাতে ধনপতির সন্দেহপরায়ণ মনটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ধনপতি তখন রাজাকে বলে —

''সাধু বলে মোর নারী সুন্দর দেখিএগ।
পঞ্জরের ছলে গোউড়ে দিছ পঠাইয়া।।''[২১৫]

ধনপতি সমাজে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী বণিক। তার সঙ্গে রাজার ঐশ্বর্য্যের তেমন তফাৎ নেই। সে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই রাজাকে সন্দেহ করতে পেরেছে। যদিও রাজা বিক্রমকেশর সেই অবস্থায় ধনপতির সম্মুখেই তার স্ত্রীকে 'জননী' বলে জ্ঞান করে জানিয়েছে। সম্ভবত কবি মানিক দত্ত সমাজের বন্ধন রক্ষা ও কাহিনীর অগ্রগতির প্রয়োজনে ব্যবহৃত করেছেন।

ধনপতির মত বীর, সাহসী চরিত্রও বিশ্বাস-সংস্কারের কাছে দুর্বল। মধ্যযুগের সংস্কারকে সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ধনপতি গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে প্রথমে 'দধিমছ্য' দেখে শুভ এবং পরে মাথার উপর 'শগিনী' বা শকুনি দেখে অমঙ্গল যাত্রা মনে করেছে। তৎক্ষণাৎ ধনপতি শিবনাম মন্ত্র জপ করে এবং জ্যোতিষিকে দিয়ে গণনা করিয়ে নিয়েছে।

অতঃপর সে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গৌড়ে পিঞ্জর তৈরী করতে গিয়ে সংসারের কথা ভুলে যায়। সংসার সম্পর্কে সে উদাসীন। তার দাম্পত্য জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রবাসে নতুন করে বিলাস জীবনের সূচনা করে। তার প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা নেই। তার জন্য খুল্লনা ও রাজা বিক্রমকেশর অপেক্ষায় রত। সতীন সমস্যা সম্পর্কে তার ধারণা থাকা সত্ত্বেও সে উদাসীন। দুর্গা কর্তৃক স্বপ্নে তার খুল্লনার কথা মনে পড়ে। সে সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে পড়ে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধটি ভুলে যায়। তাই গৌড় থেকে ফিরে এসে রাজাকে সে বলে — ''গৌউড়তে আনন্দে রহিলাম সর্ব্বথাই।''।।[২১৬] অর্থাৎ, ঘরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর কথা ভুলে সে গৌড়ে সুখভোগ, আনন্দে কাটায়। সঙ্গত কারণে, আশুতোষ ভট্টাচার্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতির চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা মানিক দত্তের ধনপতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য — ''সে ভোগী, লঘুপদে সে জীবনের পথে বিচরণ করে; প্রেমেও তাহার নিষ্ঠা নাই, খুল্লনার প্রতি আসক্ত হইবার পূর্বেই তাহার দীর্ঘদিন গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হইল এবং প্রবাসে গিয়া সে নূতন করিয়া বিলাস-জীবন রচনা

করিল, গৃহের কথা ভুলিয়া গেল। তাহার মত চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক।''[২১৭]

তবে গৌড়ে সুখ ভোগ করলেও তার আভিজাত্য গৌরব স্তিমিত হয়ে যায়নি। ধনপতি খুল্লনার দুঃখ-কষ্টের কথা জানিয়ে গৃহাভিমুখী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় গৌড়েশ্বর তাকে অর্থগৌরব দেখিয়ে খুল্লনার দ্বিতীয় বিবাহের কথা উত্থাপন করে।

''ধনপতি বলে আমি ধনের ঈশ্বর।
ধনে বান্ধিতে পারি ই সপ্ত সাগর।।''[২১৮]

এখানে আপাত সে অর্থগৌরব প্রকাশ করলেও তার মনে স্ত্রীর প্রতি দুর্বল চিত্তের প্রাবল্য অধিক। তার চরিত্রে এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

অতঃপর সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। গৃহী ধনপতি একজন ভোজন রসিক বাঙালী চরিত্র। প্রথম অন্ন সে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে খায়। অম্ল খেয়ে সে মুখ সুদ্ধি করে। বাঙালী পেটুক গৃহস্থের মত ঘুমের সময় নাক ডাক্‌তে তার জুড়ি নেই। কবির ভাষায় —

''ভোজন করিতে বসিল ধনপতি।
শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কৈল আর পশুপতি।।
গণ্ডুষ করিঞা ঝারি থূল্য বামপাশে।
অন্নবেঞ্জন খাএ আম্বল খাল্য শেষে।।
অবশেষে দধিদুগ্ধ করিল ভোজন।
ভৃঙ্গারের জলে সাধু কৈল আচমন।।
কর্পূর তাম্বুল খাঞা মুখ শুদ্ধি কৈল।
শয়ন মন্দিরে সাধু শজ্যাএ শুইল।।
*　　*　　*
খুলনা শজ্যাতে বসি ভাবিতে লাগিল।
শিহরে বসিয়া নাসা চাপিঞা ধরিল।।''[২১৯]

নিদ্রা ভঙ্গের পর খুল্লনা তার বারমাসের দুঃখ কষ্ট জানায়। কিন্তু ধনপতি পারিবারিক কলহ বা অশান্তি বৃদ্ধি করতে অনিচ্ছুক। প্রকৃত সত্য তার অজানা নয়। তাই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী গৃহকর্তার মত লহনার বিরুদ্ধে খুল্লনার রাবমাস্যার অভিযোগ এড়িয়ে যায়। সে খুল্লনাকে বলে — ''তোমর সতিনী দুঃখ দিয়াছে তোমাক।।''[২২০] এখানে সে বুদ্ধিমান বাঙালী গৃহকর্তার ভূমিকা পালন করেছে।

পিতার শ্রাদ্ধের সময় ধনপতির গৃহী রূপটি আরও স্পষ্ট। নিমন্ত্রিত কুলজ্ঞাতিদের মধ্যে কাকে প্রধান হিসেবে অভিবাদন জানাবে সে ব্যাপারে স্ত্রী খুল্লনার সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়।

''সাধু বলিছে আগে কার করি মান।
সকলির মধ্যে দেখি চান্দোকে প্রধাণ।।
এমন বিচার কৈল খুলনার সনে।
আগে দণ্ডবৎ কৈল চান্দোর চরণে।।''[২২১]

সে চাঁদকে জ্ঞাতিপ্রধান করায় অন্যান্যরা একে অপরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়। সেই সুবাদে বিষ্ণু দত্ত নামে এক জ্ঞাতি খুল্লনার ছাগল চরানোর দোষ উত্থাপন করে। তাই তারা ধনপতির গৃহে অন্নগ্রহণ করতে নারাজ। তারা ধনপতির কাছে খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলে। নয়তো ধনপতি তাদের লক্ষ টাকা দিলে অন্নগ্রহণ করবে। অন্যথা তার জ্ঞাতি ও কুল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে ধনপতি চিন্তিত। কুল-ভ্রষ্টতা জনিত জ্ঞাতির গঞ্জনা তার কাছে মৃত্যুর তুলনায় ভয়াবহ ছিল। ধনপতি এই অবস্থার শিকার হয়েছে। সে লহনাকে বলে —

''খুলনার তরে তুমি রাখাইলে ছেলি।
কপটে লেখিলে পাতি কুলে দিলে কালি।।
ছেলি চরা দোষে জ্ঞাতি খাইতে না চায়।
প্রমাদ হইল এবে কি করি উপায়।।
জ্ঞাতির গঞ্জন কথা না জাএ সহন।
গরল ভক্ষিয়া আমি তেজিব জীবন।।''[২২২]

ধনপতি সমাজের পতি হলেও সমাজের গঞ্জনা সম্পর্কে সচেতন। তাই খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষায় পরাজিত হলে তাতে লজ্জার অন্ত থাকবে না। সে খুল্লনাকে অকাতরে দোষের সত্যতা তার সম্মুখে বলতে বলেছে। তাহলে সে বণিক সমাজকে লক্ষ টাকা দিয়ে মুখ চাপা দিবে। তবে লক্ষ টাকায় সাময়িক ভাবে সে উদ্ধার পাবে। তবে তাতে স্ত্রীর কলঙ্ক সমাজ থেকে মুছে যাবে না। এসকল ভাবনা তার অতীত। সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়ে তার যুক্তি-বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

এরপর ধনপতিকে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনা করে চণ্ডীর ঘট পূজা করে। তার অরণ্য জীবনে চণ্ডীর কৃপা ও চণ্ডীর পূজার্চনা ধনপতির মত উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে পরস্পর বিরোধী ভাবনার পরিচায়ক। তাই নিজ গৃহে উচ্চবর্ণের অস্বীকৃত দেবীর পূজা তার ক্রোধের কারণ। সে দেবী চণ্ডীর ঘট লাথি মেরে ফেলে দেয়। তার ফলে তার জীবনে চলে আসে বিপদের সঙ্কেত। এই বিপরীত বর্ণের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানেও প্রযোজ্য বলে মনে হয় — ''এই আক্রোশ তার নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, তা সামাজিক। কারণ, তার পরিবারে এই সমাজ-অস্বীকৃত অনার্য স্ত্রী-দেবতার পূজা প্রচলিত হ'লে সামাজিক দিক থেকে তার অধঃপতন অনিবার্য; ধনপতি

এ ব্যাপারে তাই অস্বাভাবিক সচেতন।''[২২৩] তবে তার দাম্পত্য জীবন ভোগ খুব সামান্য। সে সুনিবিড় দাম্পত্য জীবন উপভোগ থেকে বঞ্চিত হলেও পিতা হিসেবে তার কর্তব্য-দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। সিংহলে যাত্রার সময় সে ভবিষ্যৎ পুত্রের দায়িত্ব খুল্লনার উপর বর্তায়। সে পুত্রের নাম, আদর্শ শিক্ষা এবং পুত্রকে আত্মনির্ভর করে তোলবার দায়িত্ব দিয়ে যেতে ভুলে যায় না। বরং সে বারবার পুত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার উপর প্রবল জোর দিতে বলেছে। সে খুল্লনাকে বলেছে —

''ধনাই পণ্ডিতের ঠাই পুত্রকে পড়াইবে।
ইহ বাক্য কদাচিত অন্যথা নহিবে।।
পড়িয়া বালক হৈবে অতি বিচক্ষন।
পিতার উদ্দিশে জাইবে দক্ষিন পাটন।।
পুত্র পড়িএগা জদি ঘরে অন্ন খাএ।
বাপ তার গাধা গাধিনী তার মাএ।।''[২২৪]

ধনপতি ও তার স্ত্রী খুল্লনা উচ্চবর্ণের সমাজ কর্তৃক আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধি-বিদ্যায় বিচক্ষণ হলে সমাজের কূটকৌশল সম্পর্কে সে সচেতন হতে পারত এবং তার আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হত। ধনপতি পুত্রের শিক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

অনাগত পুত্রের ভার স্ত্রীর কাছে অর্পণ করে বণিক ধনপতি সিংহলে চন্দন আনতে যাত্রা করে। সেখানে কোতালদের সে স্পষ্ট ভাবে বলেছে যে, আতিথেয়তার সুব্যবস্থা পায় তাহলে চন্দন কিনবে। অতঃপর সে রাজাকে বস্ত্র ও নানা দ্রব্য ভেট দেয়। তখন রাজা তার পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় পত্রের সঙ্গে ধনপতি কালিদহে কমলে-কামিনীর কথা বলে। সে রাজাকে বলে যে সেই মূর্তি দেখলে পাপ বিমোচন হয়। একথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাকে বন্দী করা হয়। এই কারণে ধনপতি ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। তার মত পৌরুষ বীর চরিত্রের ক্ষেত্রে তা বেমানান ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

''কান্দে ধনপতি হাসেন ভগবতী
কেন কান্দ সাধুর নন্দন।''[২২৫]

বন্দী দশায় ধনপতির দুর্বল, শিশুসুলভ আচরণ হাস্যকর বোধ হয়। পরিস্থিতির কাছে সে হার মেনেছে, কঠোর দৃঢ়তা তার মধ্যে বড়ই অভাব। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চারিত্রিক গুণাবলী পরিবর্তন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে চরিত্রটি ঘটনার অনুগামী। সে প্রতিটি ঘটনার থেকে উত্তরণের জন্য লড়াই করেনি। এই অবাঞ্ছিত উপদ্রব ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তার ইষ্ট দেবতা

শিবের প্রতি কোন নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করা যায় না। চাঁদ সদাগরের মত লড়াই করে বেঁচে থাকার আত্মপ্রত্যয় ধনপতির মধ্যে একান্ত অভাব। সে বন্দী হয়ে বলেছে —

‘‘দুর্গা লাগিলবাদে দুঃখ দিল নানামতে
আর না জাইব উজয়ানী।
ধনপতি কান্দে কেশ বেশ নাহি বান্ধে
আর না দেখিব সুন্দর খুলনী
* * *
জে হইতে লংঘিলাম বারি সেহি হইতে দুঃখে মরি
দেশ ছাড়ি হৈলাঙ দেশান্তরি।
এবার উদ্ধার কর এক লক্ষ বলি দিব
বারেক উদ্ধার মহেশ্বরি।।’’[২২৬]

তার চিত্ত দুর্বলতা তাকে সাধারণ মানুষের ভিড়ে দাঁড় করিয়েছে।

তবে তার মধ্যে অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ রয়েছে। দুর্গা নাম স্মরণ করে শ্রীমন্ত পিতাকে নিয়ে উজানি নগরে ফেরার সময় মগরায় পৌঁছায়। তার সঙ্গে আসা মৃত মানুষগুলির পরিবার সম্পর্কে ধনপতির ভাবনা জাগ্রত হয়েছে। ধনপতি বাড়ি গিয়ে কি মুখে তাদের সামনে দাঁড়াবে? তাই ধনপতি শ্রীমন্তকে বলেছে — ‘‘মগরাতে ডুব্যা মল্য জার বাপ ভাই।/ কি বল্যা পাত্যাব আমি তা সভার ঠাই।।’’[২২৭] স্বাভাবিক ভাবেই ঐসকল পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য ধনপতিকেই দায়ী করবে। তাদের অপবাদ সম্পর্কে চিন্তিত। সে মগরায় এসে চণ্ডীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করছে। এই ক্রোধ শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব বলে মনে হয়। এই বিপরীত বিরোধী ধর্মে বিশ্বাসী এবং একই গৃহে থাকা পিতা পুত্র তার মূর্ত প্রতীক।

শুধু তাই নয় আত্ম অহমিকা ও সামাজিক অবস্থান গৌরব তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সে সিংহল থেকে এসেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। সে গিয়েছিল রাজাকে তার মান-সম্মান ও গৌরব বোধ উন্নতির সম্বন্ধে সজাগ করতে। শেষ পর্যন্তও ধনপতি তার আভিজাত্য গৌরব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কবি তার চরিত্রের উপকরণ বাঙালী ধনী অভিজাত পরিবার থেকে সংগ্রহ করে তাকে অঙ্কন করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার ফলে চরিত্রটি বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থানের ছবি মাত্র হয়েছে। সে রাজাকে বলে —

‘‘সাধু ধনপতি তবে বলিতে লাগিল।
সিংহল নগরে বড় মোর মাণ হৈল।।
দুর্গা করাইল এবে শ্রীমন্তের মান।

অর্দ্ধরাজ্য দিল আর কন্যা দিল দান।।''[২২৮]

একথা শুনে রাজা বিক্রমকেশর তার পুত্রের কাছে কন্যা বিবাহ দেবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। কিন্তু ধনপতি পুত্রের ক্ষেত্রেও আবার সতীন সমস্যা দেখা দিবে বলে তাতে নারাজ। রাজা বিক্রমকেশর তার কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের বিবাহ দেয়। অতঃপর ধনপতি ব্যতীত পরিবারের সকলে মিলে দেবী চণ্ডীর পূজা করে। সেও সকলের অনুরোধে বাধ্য হয় চণ্ডীর পূজা করতে। কবির ভাষায় —

''বন্ধনের কথা সাধু মনে কৈল।
ভবানী পূজিতে সাধু একচিত্ত হৈল।।
পূজার জতেক দ্রব্য একত্র করিল।
ধনপতি দুর্গাপূজা করিতে লাগিল।।
নম২ নম মাতা নম নারায়নি।
আমাকে কর গো দয়া আদ্যা ভবানী।।
আদ্য মন্ত্রে ধনপতি দুর্গাকে স্মরিল।
ভগতবচ্ছলা দুর্গা দরশন দিল।।
ধরনী লুটাএঞা সাধু চরন বন্দিল।
প্রসন্ন হইএঞা মাতা আশীর্ব্বাদ দিল।।''[২২৯]

ধনপতি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত। সমাজের মেনে নেওয়া ধর্ম ও দেবীকে সে মানতে বাধ্য হল। অরবিন্দ পোদ্দার মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি চরিত্রের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা এখানেও তুলে ধরা যায় — ''ধনপতির এই সংগ্রাম প্রশংসনীয় হলেও নিষ্ফল; কেন না, তার দেবতা ও আদর্শ ইতিমধ্যেই সমস্ত সামাজিক মূল্য এবং সৃষ্টিমূল্য হারিয়ে ফেলেছিল। ... পরিণামে শ্রীমন্তের কল্যাণে, তার হারান সম্পদ পুনরুদ্ধৃত হ'লে সে দেখতে পেলো তার সনাতন আদর্শকে জুড়ে আছে এই নতুন আদর্শ, দুই আদর্শ এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু এই এক হওয়ার মধ্যে পুরাতন আর ঠিক পুরাতন নয়, নতুন প্রভাবে তা রূপান্তরিত। তাই পুরাতন আদর্শও এক নতুন সত্যে প্রকাশিত হলো। ধনপতি নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকালো।''[২৩০]

ধনপতির একমাত্র পুত্র **শ্রীমন্ত**। খুল্লনা তার মাতা। সে বণিক খণ্ডের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র। তাকে অন্যান্য কাব্যে শ্রীপতিও বলা হয়। স্বর্গের নর্তক মালাধর মর্তে শ্রীমন্ত নামে জন্মগ্রহণ করে। কাহিনীর পরিধিগত দিক দিয়ে ধনপতি খণ্ডের অর্ধেক অংশ সে অধিকার করে রয়েছে। ধনপতির মত তারও ধনগৌরব রয়েছে, তবে পিতার তুলনায় চরিত্রটি অনেকটাই জীবন্ত।

শ্রীমন্তের জন্মের পর তার পিতৃদর্শন হয়নি। পিতা ধনপতি সিংহলরাজ দ্বারা কারাবন্দী

হয়ে ছিল। পিতৃহীন মাতার আদরের ফলে তার শৈশব কাল অত্যন্ত দুরন্তপণায় ও চঞ্চলতায় কাটে। সে ষাট দত্তের পুত্র ভোলার চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ণ করে। মানিক দত্ত অত্যন্ত নিপুণ ভাবে শ্রীমন্তের এই দুরন্তপনার চিত্র এঁকেছেন —

''ষাইট দত্তের বেটা নাম তার ভোলা।
তার চক্ষে শ্রীমন্ত তুলিয়া মারে ধুলা।।''[২৩১]

খুল্লনা শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে শিশুদের এই অভিযোগে মর্মাহত হয়। সে তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে; খুল্লনা শ্রীমন্তের দুষ্টুমি থেকে নিরস্ত করতে গুরু গৃহে পড়াশুনা করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। খুল্লনার আদেশ মত দাসী দুর্বলা শ্রীহরি পণ্ডিতকে বাড়িতে ডেকে আনে। শ্রীমন্ত তার অধীনে পড়াশুনা শুরু করে। চঞ্চল শ্রীমন্ত পড়াশুনায় খারাপ ছিলনা। গুরুগৃহে সে অল্পবয়সেই বর্ণ পরিচয়, অভিধান পাঠ সমাপ্ত করে। সে দিনে গুরুগৃহে পড়াশুনা করতে যেত এবং রাতে দেবী চণ্ডী আসত তাকে পাঠ দেবার জন্য।

''দিবসে পড়েন সাধু গুরুপাট স্থানে।
রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে।।''[২৩২]

পাশাপাশি তার সুন্দর রূপের সঙ্গে হাতের লেখাও ছিল সুন্দর ও স্পষ্ট। তার এই সুন্দর অক্ষর বুননের পিছনে তার ধৈর্য্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের কঠোর ভূমিকা ছিল। ''লেখিঞা সুন্দর কৈল সকল অক্ষর।''[২৩৩] কর্মের প্রতি এই নিষ্ঠা ও প্রত্যয় তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। তার চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে শৈশবকাল ছিল ভূমিকা স্বরূপ, বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে, তার বাল্য বয়সে মাতার আদরে এবং অভিজাত গৌরবে তার মানবিকবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। খুল্লনা পণ্ডিতকে প্রচুর সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে বিদায় জানায়। গুরুর বিদায়কালে গুরু শ্রীমন্তের হাতে পুথি ও খড়ি তুলে দেওয়ার সময় চণ্ডীর মায়ায় শ্রীমন্তের হাত থেকে খড়ি মাটিতে পড়ে যায়। তার গুরুকে তা সে তুলতে আদেশ দেয়। তার ব্যবহারে গুরু রুষ্ট হয়ে তাকে 'জারুয়া' সম্বোধনে গালিগালাজ করে। সে বলে —

''সাধুকে পণ্ডিত বলে জারুয়া বচন।
মাতা তোর খুলনা পিতা কুনজন।।''[২৩৪]

পণ্ডিত তাকে 'জারুয়া' বা 'জারজ' বললে তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। তার চরিত্রে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মাথায় পুথির আঘাত করে গৃহে চলে আসে। সে গৃহে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। লক্ষণীয়, সে মৌখিক প্রতিবাদের কোন ভাষা পায়নি। কারণ জন্মের পর সে কোন দিন তার পিতাকে স্বচক্ষে দেখে নি। বাইরে প্রকাশ করা তার পক্ষে লজ্জা ও অপমানের সামিল। মায়ের কাছে অভিমানে ও রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে —

''মাতাকে বলেন সাধু ঘরে থাকিঞা।/ আমার লাগিয়া কেন ফিরিছ কান্দিঞা।।
কপাট ধরিঞা কথা বলেন শ্রীপতি।/ মাতা আছ বিদ্যমান পিতা গেল কতি।।
শ্রীমন্ত বলেন মাতা না কর কন্দন।/ পণ্ডিতে বলিল মোকে জারূয়া বচন।।
কি হইল মোর পিতা দেহত কহিঞা।/ নহিলে মরিব আমি গরল ভক্ষিয়া।।''[২৩৫]

সে এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ, জেদি ও একগুঁয়ে দৃঢ়চিত্ত। পিতাকে সে ফিরিয়ে আনবেই, না হয় আত্মহত্যা করবে। কারণ সে বুঝতে পারে যে, পিতা ছাড়া সমাজে চলা কতটা কন্টকাবৃত ও যন্ত্রণা দায়ক। এখানে শ্রীমন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মাভিমানী, তেজস্বী ও প্রতিবাদী চরিত্র।

পাশাপাশি, শ্রীমন্ত সমাজ সচেতন চরিত্র। অল্প বয়সেই সে সমাজের কঠোর উপহাসনীতিকে নিরীক্ষণ করে নিয়েছিল। সিংহলে পিতাকে ফিরিয়ে আনতে যাবার সময় মাতাকে সমাজের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সম্পর্কে সচেতন করিয়ে যায়। পুরুষ অভিভাবকহীন সংসারে একজন নারীকে সমাজ যে কী নিন্দনীয় অপবাদ দিতে পারে, সে ব্যাপারে সে মাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সজাগ করেছে —

''নিবেদিএ তুয়া পদে শুনহ বচনে।
কুলধর্ম্মশীল মাতা রাখিহ জতনে।।
কহি গো তোমারে জ্ঞাতির বড় ত্রাস।
কিঞ্চিত দেখএ দোষ করে উপহাস।।''[২৩৬]

কিন্তু খুল্লনা শ্রীমন্তকে বোঝায় তার পিতা ধনপতি প্রায় বারো বছর আগে বাণিজ্যযাত্রা করে আর ফেরেনি, সেও যদি সে পথ অনুসরণ করে একই কাজ করে তবে খুল্লনা অনাথা হয়ে যাবে। শ্রীমন্ত মায়ের এসব কথায় প্রচণ্ড চটে গিয়ে মাতৃ চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করে বলে —

''পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।
স্বামী করিঞা মাতা তোরে নাঞি মন।
অবিচার করি কেনে করিছ ক্রন্দন।।''[২৩৭]

এখানে সমাজের আগ্রাসী নীতি ও সমাজ বর্হিভূত কাজে পরিহাসপরায়ণ দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীমন্তের কথা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

শ্রীমন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চরিত্র। দক্ষিণ পাটন পৌঁছে সে কোতাল দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। তাদের কাছ থেকে উত্তরণের জন্য সে মন টলানোর মত অর্থ প্রদান করে।

''একশত তঙ্কা সাধু দিঞা কোতালকে।
ঘাটে বান্ধিয়া রাখে সপ্ত নোকাকে।।''[২৩৮]

অতঃপর সে সিংহল রাজ্যে উপস্থিত হয়। যাত্রা পথে সে দেবীর কমলে-কামিনী রূপ দেখে। তা রাজার সাক্ষাতে বলে। তার বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে দু'জনের মধ্যে শর্ত হয়। শর্তে শ্রীমন্ত হেরে

যাওয়ায় তার সমস্ত ধন লুট করা হয় এবং তাকে মশানে মুণ্ডু ছেদন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাই সে পিতা উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ায় অত্যন্ত শোক প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত রাজা শালবানের সঙ্গে শর্তে জিতে। শর্তানুসারে সে তার কন্যা সুশীলাকে বিবাহ করে এবং দান স্বরূপ বন্দীশালা চায়। সেই বন্দীশালায় পিতাকে সনাক্তকরণের জন্য পত্র বিবরণ ব্যবহার করেছে। পিতাকে সে সনাক্তকরণ করেও পিতার কাছ থেকে তার সত্যতা পরখ করে নিয়েছে।

ঠিক এই রূপ বিচক্ষণ পরীক্ষক চরিত্র শ্রীমন্ত। সে পিতাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। পিতা-পুত্রের আগমন বার্তা শুনে খুল্লনা উল্লসিত। তাই সে দেবীর উপাচার নিয়ে নৌকা পূজা করতে নদী তীরে উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত লক্ষ্য করে যে, তার মায়ের দীর্ঘদিন পরে আগত পিতার তুলনায় নৌকা পূজার দিকে ধ্যান বেশি। শ্রীমন্ত মনে মনে মায়ের বিপথগামিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করে। তার প্রত্যয় নির্ণয়ে সে পিতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের পরীক্ষা করার জন্য পিতার 'নেত' বা সূক্ষ্মবস্ত্র মাটিতে রাখে। কবির কথায় ''নোকা হইতে দিষ্ট করে সাধুর নন্দন।/ আজি মাএর কিছু বুঝি দেখি মন।।/ পিতার নেতখানি ভূমে বিছাইল।/ তাহা দেখি খুলনা রামা চমকিত হৈল।।''[২৩৯] মাতার দুর্বল চিত্তকে সন্দেহ করে এবং তা যাচাই করে নেয়। পিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পিতা ধনপতি সিংহলে অবস্থানকালে তার গৌরব ও মানসম্মানবোধ বজায় ছিল সে সম্বন্ধে উজানীর রাজা বিক্রমকেশরকে জ্ঞাত করায়। সে পুত্রের অর্ধরাজ্য অধিকার এবং রাজ-কন্যা লাভ করার বিষয়টি উত্থাপন করে উন্নত আত্মমর্যাদাবোধ উপলব্ধি করে। তাতে বিক্রমকেশরের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। সেও তার কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য পিতা ধনপতির কাছে বলে। কিন্তু ধনপতি তাতে অস্বীকৃত হলে রাজা তাকে বন্দী করে। পিতার বন্দী দশা শুনে শ্রীমন্ত বিচলিত হয়। সে দোলায় চড়ে রাজ-স্থানে উপস্থিত হয় এবং পিতার বন্দীর কারণ জিজ্ঞাসা করে। সে জয়াবতীকে বিবাহ করতে রাজার কাছে সম্মতি জানায়। বিবাহের বার্তা শুনে সুশীলা বৈধব্য বেশ ধারণ করতে চাইলে সে তার স্ত্রীর স্বল্প সমাজ অভিজ্ঞতা ও হঠাৎ বিভ্রান্ত হৃদয় লক্ষ্য করে হাসে। শ্রীমন্ত সুশীলাকে সতীনদের দাসী বৃত্তিতে অবস্থান সম্বন্ধে প্রবোধ দিয়ে বলে —

''সুশীলার তরে সাধু বলিছেন হাসি।
জয়াকে আনাঞা তব করাইব দাসী।।''[২৪০]

সুতরাং শ্রীমন্ত চরিত্রে আভিজাত্য গৌরববোধ থাকলেও মনুষ্য জীবনের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি তার মধ্যে থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। সে পিতা ধনপতির তুলনায় অনেক বেশি জেদি, দৃঢ় চিত্ত ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন চরিত্র। কবি তাকে বণিক পরিবারের পরিচয়ের চিত্র না করে রক্ত মাংসের জীবন্ত প্রাণে পরিণত করেছেন।

এবার আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের মানব চরিত্র রূপে প্রধান নারী চরিত্রগুলির আলোচনায় প্রবেশ করব। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নানা শ্রেণীর মানুষের ছবি বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই কাব্যের ধনপতি খণ্ডে যে সকল নারী চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে তারা মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও নারী চরিত্রগুলি বিস্ময়কর। আবার কখন কখন নারী চরিত্রগুলি কাহিনী অনুগামী, সমাজ ও তার রীতি-নীতির আদর্শ প্রতীক হয়ে উঠেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এইরূপ প্রধান নারী চরিত্রের সংখ্যা অল্প হলেও অবহেলার নয়।

বণিক খণ্ডের প্রধান ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারী চরিত্র **লহনা**। সে বণিক ধনপতির প্রথমা স্ত্রী। প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন — ''লহনা শব্দের পারস্যভাষায় বিপদ্ = দায় = ঝঞ্ঝাট; — ঐ স্ত্রীর যেরূপ স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ধনপতি উহাকে লইয়া বিলক্ষণ দায়ে পড়িয়াছিলেন, বলিতে হইবে। সুতরাং উহার 'লহনা' নাম সার্থক হইয়াছে।''[২৪১] তার যৌবন বিগত প্রায়। তার চরিত্রে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব এতটাই মনস্তাত্ত্বিক যে অন্যান্য নারী চরিত্র তার কাছে নিষ্প্রভ। কবি মানিক দত্ত চরিত্রটি বর্ণনায় বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

লহনা বণিক নিধুপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বাসগৃহ ইন্দ্রানী। সে চণ্ডীর ব্রতদাসী। সাত বছর বয়স থেকে গৌরী পূজা করে। সে প্রতিনিয়ত দেবীর কাছে ভালো ঘর, বর ও ধনী গৃহে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

''ঘর বর ভাল হয় স্বামী ভাল কয়ে।
জন্মাবধি পূজিমু তোমাক এই মনে লয়ে।।''[২৪২]

লহনা সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত টানা ছ'বছর দেবী চণ্ডীর আরাধনায় নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রাখে। কিন্তু তার বিবাহ সম্পন্ন হয় না। সে দেবীর কাছে অধৈর্য হয়ে পুনরায় স্বীয় বিবাহের কথা উত্থাপন করে। বিবাহের জন্য বাল্য বয়স থেকেই সে অধীর। পিতার তুলনায় সে বিষয়ে লহনা অধিক ব্যাকুল। এই অবস্থায় দেবী তাকে আশ্বাসবাণী দেয়। তখন লহনা দেবী চণ্ডীর জন্মান্তর ধরে পূজা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কারণ, তার মনে একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বিষয় হল স্বামী। সে দেবী চণ্ডীকে বলে —

''মা জাবত শরীরে মোর থাকয়ে জীবন।
তুয়া পদ না ছাড়িমু জনমে জনম।।
ব্রহ্মবাক্য লংহি হয় নরকে গমন।
পতির কারণে তোমার লইলাম শরণ।।''[২৪৩]

বাল্য বয়সেই লহনা দেবী চণ্ডীর কাছে রামায়ণে সীতার রামকে পতি হিসাবে পাওয়ার প্রসঙ্গে

উত্থাপন করে। অল্প বয়সেই তার পুরাণ জ্ঞানের পরিচয় মেলে। শৈশব থেকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা , কুল-শীল ও ধন-সম্পত্তির সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। বণিক সন্তান লহনার মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও সমাজে উন্নত স্থান পাওয়ার বিলাস ভাবনা বর্তমান। দেবীর কাছে তার এরূপ মানত সেকালের নারী সমাজের চরম দুরবস্থা ও পুরুষ জাতির বিপথগামীর দিকে আমাদের অভিনিবেশ ঘটায়। শৈশবে তার এরূপ মানসিক গঠন যৌবনে তাকে পথ দেখিয়েছে।

বিবাহের পরে লহনার মধ্যে দেবীর প্রতি মনোনিবেশের অভাব ঘটেছে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে বিবাহের পর চণ্ডী পূজা ভুলে যায়। দেবী চণ্ডী তাকে আঁটকুড়া ও সতীন সমস্যার অভিশাপ দেয়। তার জন্য ধনপতিকে আঁটকুড়া অপবাদ শুনতে হয়। সমাজের সকলে তার মুখ দেখতে চায় না। ধনপতি একথা লহনাকে বলে। তখন লহনা ধনপতির উপর দোষারূপ করে। লহনা ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে অশ্লীল কথাবার্তা বলে। যা তাকে বণিক পরিবার বহির্ভূত অশিক্ষিত, রুচিহীন ও সংস্কারহীন নীচ পরিবার ভুক্ত চরিত্রে পরিণত করেছে। সে ধনপতিকে বলে —

''পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।
ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া।।''[২৪৪]

লহনার এই আচরণে বিরক্ত ধনপতি উজানী নগরে পায়রা উড়াতে চলে যায়। সেখানে লহনার খুড়তুতো বোন খুল্লনাকে দেখে সে মোহ মুগ্ধ হয়। অতঃপর খুল্লনার সঙ্গে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ স্থির হয়। সে ধনপতির বিবাহের জন্য কারিগর এনে অলঙ্কার তৈরীর অধীর আগ্রহ লক্ষ্য করে। তাতে তার নারী হৃদয় দগ্ধ হয়। সে স্বামীকে ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার কথা আগাম সচেতন করে সে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নতুন অস্ত্র ব্যবহার করে। লহনা চায় না তার খুড়তুতো বোন তার সতীন হোক। কিন্তু তার জীবনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ বর্ষিত হয়। ধনপতি খুল্লনাকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য মনস্থির করে। ধনপতি সেই খুল্লনার জন্য গহনা তার হাত দিয়ে পাঠায়। লহনাকে দেখে খুল্লনা প্রণাম করে। তখন লহনা বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত আশির্বাদ করলেও অন্তরে তার বিষ বর্ষিত হয়। তা সে বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। সে মনে এক বাইরে আর এক রকম আচরণ করতে বাধ্য হয়।

''খুলুনা আসিয়া লহনা দিদির চরণ বন্দিল।
নিমের অধিক তিতু রামা আশীর্ব্বাদ কৈল।।''[২৪৫]

এখানে লহনা অত্যন্ত মনস্তত্ত্বসম্মত এবং বাস্তবানুগ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় লহনা চিন্তিত। তার রূপ ও যৌবন বিগত। তবু সে তার স্বামীর চোখের মধ্যমণি হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু আজ তার চেয়ে সুন্দরী ও যুবতী বোনই তার সতীন। আর স্বামীর নজর সতীনের দিকে। এই যন্ত্রণা লহনা সহ্য করতে পারছে না। নারীর

এই যন্ত্রণা স্বাভাবিক। খুল্লনার রূপ-যৌবন নাশ করতে সে দুর্বলাকে দিয়ে নিলাবতী নামে ব্রাহ্মণীকে ডেকে এনেছে। স্বামী যাতে তার রূপে আকৃষ্ট হয় এবং তার অধিগত থাকে — সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। সেই জন্য নিলাবতীকে দিয়ে তুক্‌তাক করিয়ে নিচ্ছে।

''গাছ পত্র দেহ মোকে সই নিলাবতী।
সামীর সহিতে মোরে করাহ পীরিতি।।''[২৪৬]

সে নিলাবতীর বশীকরণ-মন্ত্র এবং তার চোখেরবালী স্বরূপ খুল্লনার রূপ-যৌবন হরণ করার কথা শুনে আনন্দিত। সে নিলাবতীর সঙ্গে খুল্লনার রূপ, অলংকার, ধন প্রভৃতি সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কুট বুদ্ধিতে লিপ্ত হয়। সে নিলাবতীকে দিয়ে ধনপতির জাল চিঠি লিখিয়ে নেয়। তার কথা মত নিলাবতী চিঠি লিখে চলে যায়। সে সময় লহনা খুল্লনার প্রতি ধনপতির বিরূপ চিঠি পাঠ করে এবং উচ্চস্বরে কান্নার অভিনয় করে। ''পত্র লেখি দিঞা নিলাবতী ঘরে গেল।/ লহনা পত্র নঞা কান্দিতে লাগিল।।/ খুলনা ভ্রমরা তীরে স্নানে গিঞাছিল।/ লহনার ক্রন্দন শুনি খুলনা আইল।। / ... লহনা বলেন খুলনা শুন তুমি।/ কুমঙ্গল পত্র পঠাঞা দিল সামী।।/ লহনা খুলনার হস্তে পত্রখানি দিল।/ পত্র নঞা খুলনা সকল পড়িল।।''[২৪৭] একদিকে লহনা খুল্লনার প্রতি সর্বনাশের ফাঁদ পাতে। আর বাইরে তার প্রতি সহানুভূতি ও সমব্যথা প্রকাশ করে। লহনার এইরূপ আচরণ তাকে জীবন্ত ও নাটকীয় করে তুলেছে। ফুল্লরার সতীন সমস্যা জনিত মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের তুলনায় মানিক দত্ত লহনাকে অনেক বেশী মনস্তাত্ত্বিক করে তুলেছেন।

কিন্তু তার সমস্ত চাতুরতা খুল্লনার শিক্ষার কাছে পরাস্ত হয়। খুল্লনা বুঝতে পারে যে, চিঠিটা নিলাবতীর হাতে লেখা। এটা খুল্লনা তার সামনে প্রকাশ করলে লহনা ঈর্ষা, হিংসা ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। তৎক্ষণাৎ নিজের ক্রোধকে বশীভূত করতে না পেরে খুল্লনাকে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। লহনার এইরূপ ব্যবহারে তাকে সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবার থেকে একেবারে গ্রাম্য গৃহস্থ রমণী পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। তার কথায় খুল্লনার রূপ সৌন্দর্য এবং গৃহ সম্পদের অধিকার করায়ত্ত করাই তার ঈর্ষার প্রধান কারণ।

পাশাপাশি লহনার আত্মসম্মান বোধ প্রবল। সতীনের সঙ্গে গৃহে ঝগড়া করবে, কিন্তু তা বাইরের মানুষ দেখবে — এটা তার মান-সম্মানে বাধে। সে গৃহের কথা বাইরে প্রকাশ করতে চায় না। তাই তাদের ঝগড়া শুনতে বণিক রমণীরা সেখানে উপস্থিত হলে তাদের বলে — ''জদি বা ঝগড়া শুন খাও পুত্রের মাথা।।''[২৪৮] লহনা জানে একমাত্র সন্তানের দোহাই দিলেই তারা চলে যাবে। পরিস্থিতি বুঝে সমাজ সচেতন লহনা তাকেই হাতিয়ার করে নিয়েছে। সতীন ভাবনা লহনাকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে। খুল্লনা তার খুড়তুতো বোন হলেও তার প্রতি সতীন সুলভ আচরণ করতে একটুও বাঁধে না। এরপর সে খুল্লনার সমস্ত অলংকার খুলে নিয়ে তাকে ছাগল চরাতে

পাঠিয়েছে। নিজে পালঙ্কে শুয়ে খুল্লনাকে ঢেঁকিশালায় শুতে দিয়েছে।

এরূপ কঠোর চরিত্রও দুর্গার স্বপ্নাদেশে ভীত। সে এখন খুল্লনাকে স্নেহে যত্নে রাখতে ব্যস্ত। তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাতে লহনা সতীন খুল্লনার প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করতে শুরু করে। এই প্রথম খুল্লনাকে সে 'বোন' বলে সম্বোধন করে এবং বিভিন্ন প্রকার তোষামোদ করে গৃহে ফেরাতে বনে এসে উপস্থিত হয়। সে ভয়ে বলে — ''স্বামী আইলে দুখ না বলিহ তারে।।''[২৪৯] কেননা, সে জানে এই অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে। লহনার আদর আপ্যায়নের কারণ খুল্লনা বুঝতে পারে। তাই সে লহনাকে একটু শ্লেষের সুরে বলে— ''দুর্গার কৃপাতে দিদি মোর হৈল সুখ।''[২৫০] খুল্লনার এই সুখের কারণ লহনা বাইরে প্রকাশ করেনা। কিন্তু খুল্লনা লহনার অন্তরগহনে লুকিয়ে থাকা ব্যথা অন্যভাবে প্রকাশ করে, যা লহনার কাছে অপ্রতিরোধ্য ও দুঃসহ। কিন্তু তার কাছে এই পরাজয় অত্যন্ত লজ্জাজনক।

লহনার ধনসম্পত্তির উপর লোভ প্রবল। ধনপতি রাজপরিবারের প্রয়োজনে দক্ষিণ পাটন যাত্রা করার পরিকল্পনা করে। খুল্লনা স্বামীকে চক্ষুর আড়াল করতে চায় না। সে বলে ঘরের আগর চন্দন রাজাকে দিয়ে দিতে। একথা শুনে লহনা রান্নাঘর থেকে ক্রোধান্বিত হয়ে বের হয়। খুল্লনার প্রতি সে ব্যঙ্গ করে বলে —

''তেজিয়া রন্ধন শাল ক্রোধে হইল চন্দতাল
ব্যাঘ্ররূপে বাহিরাইল লহনা।।
প্রভু তথা গেলে পাইবা দুখ দেখহ কামিনীর মুখ
সর্ব্বস্ব রাজার তরে দিঞা।''[২৫১]

কীভাবে পরোক্ষ দংশন করা যায় সে ব্যাপারে তার জবাব নেই। সেই সঙ্গে গৃহসম্পদ গচ্ছিত রাখতেও সে সচেতন। ধনপতি লহনার চারিত্রিক স্বভাব অনুধাবন করতে পারে। খুল্লনার কথা চিন্তা করে ধনপতি যাত্রার প্রাক্কালে সম্পত্তি ভাগ করে দেবার কথা বলে। তখন লহনা অত্যন্ত কৌশলে ধনপতির মনোবাঞ্ছাকে বিপরীতমুখী করে দেয়।

''আমি তোমার ভাগী নই ২ সহোদর।
পাপী স্ত্রিয়ার কারণে বাটীব বাড়ী ঘর।।
খুল্লনা হবে ঠাকুরানী দাসী হৈব আমি।
কম্ম করিঞা খাইব ভাত কিসের অভিমানী।।''[২৫২]

কতটা কপটতার সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যকে সফলতার পথে আনা যায় তা লহনাকে না দেখলে বোঝা যায় না। তার উদ্দেশ্য সে একাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। এই জন্য আবার তাকে খুল্লনার চরিত্র স্খলন দেখাতে হয়। ধনপতির যাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা স্বামীর শুভযাত্রা কামনা করে

দুর্গা পূজা করতে বসে। লহনা ভাবে খুল্লনা দরজা বন্ধ করে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছে। লহনার কাছে প্রতিশোধ নেওয়ার এই সঠিক সময়! সে চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে ধনপতিকে ডেকে নিয়ে আসে।

''চলিল লহনা জথাতে ধনপতি।
কপটে কহেন কথা হইঞা অশ্রুমুখী।।
তোমার কারণে প্রভু বিদরে মোর হিয়া।
খুলুনা কি কম্ম করে হের দেখসিআ।।''[২৫৩]

লহনার চতুরতা অস্বাভাবিক। তার প্রতি বিশ্বাস জাগানোর জন্য নয়নের জল ফেলতে তার জুড়ি নেই। খুল্লনার প্রতি স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাসে সন্দেহের ও বিরূপতার বীজ সৃষ্টি করে স্বামীর প্রতি সহানুভূতি অর্জন করেছে। মানিক দত্তের লহনার মত কৌশলী চরিত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিরল।

কিন্তু লহনা স্বামীর বন্দী দশার কথা শুনে খুল্লনার সঙ্গে সমান ক্রন্দন করে এবং খুল্লনার গর্ভাবস্থায় তার প্রতি সুব্যবহার করে। কিন্তু লহনার এই রূপ আচরণ ক্ষণস্থায়ী। পরক্ষণে শ্রীমন্তকে না পেয়ে খুল্লনার ক্রন্দন দেখে সে আনন্দে ফেটে পড়ে এবং সে বলে — ''আজি হৈতে দুই সন্ধ্যা রন্ধন টুটিল।।''[২৫৪] এমনকি দক্ষিণ পাটনে শ্রীমন্তের মৃত্যুর সংবাদে খুল্লনার ক্রন্দন দেখে লহনা কান্নার অভিনয় করেছে। সে চোখে সরিষার গুড়া দিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করে। তার মধ্যে বিমাতার কঠোর হৃদয়হীনতার রূপটি স্পষ্ট। পাশাপাশি খুল্লনার সন্তান হারানোর বেদনা তার মত বন্ধ্যা নারীর ক্ষেত্রে আনন্দের। তার চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উপভোগ্য। অতঃপর তাকে কাব্যে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবু এই সামান্য পরিসরেই কবি তাকে যতটা মনস্তাত্ত্বিক রূপে অঙ্কন করেছেন — তা বিস্ময়ের বিষয়। অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় লহনার চারিত্রিক গুণাবলী অনেক বেশি আকর্ষণীয়, সর্বোপরি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বটে।

বণিক খণ্ডে অপর একটি প্রধান নারী চরিত্র **খুল্লনা**। তার পিতা বণিক লক্ষপতি এবং মাতা রম্ভাবতী। তাদের বাসস্থান ইছানী নগরে। তার সঙ্গে বণিক ধনপতির বিবাহ হয়। সে ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী। তার একমাত্র সন্তান শ্রীমন্ত। এই সতীন সহ দাম্পত্য জীবনে গার্হস্থ্য রূপ চিত্রিত হয়েছে।

খুল্লনা স্বর্গে ইন্দ্র-সভার নর্তকী রত্নমালা নামে পরিচিতা। মর্ত্যে রত্নমালা রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লনা নামে জন্মগ্রহণ করে। সে লহনার তুলনায় যুবতী ও সুন্দরী। সম্পর্কে লহনা তার জ্যাঠতুতো দিদি এবং পরে তার সতীনে পরিণত হয়। তার বাল্য বয়সে সখীদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় অতিক্রান্ত হয়। একদিন ধনপতির পায়রা তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সেই পায়রা তার আঁচলে আবদ্ধ হলে তাকে বন্দী করে। তাতে খুল্লনা পায়রাকে উদ্দেশ্য করে পুরুষ জাতির ভ্রমরবৃত্তির

আচরণের কথা উল্লেখ করে। খুল্লনা তাকে বলে —

''জাহার জৌবন দেখি ভুলিল তোমার মতি
তাহার নাহিক নিজ পতি।।''[২৫৫]

খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির পায়রার স্বল্পাভাসে রতিসম্ভোগ কলা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু খুল্লনার মুখে তার স্বামীহীন যুবতীর গোপন পরিচয় পেয়ে পায়রা তাকে সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। একথা শুনে খুল্লনা কলঙ্কের ভয়ে কাঁপতে থাকে। এখানে খুল্লনা গোপন অভিসন্ধির শিকার এবং সমাজ ভয়ে ভীত।

পায়রা সন্ধানে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাৎ হয়। ধনপতি তাকে পায়রা বন্দীর অপবাদ দেয়। তাতে খুল্লনা অপমান ও লজ্জা বোধ করে। সে তার পায়রা ফিরিয়ে দেয়। ধনপতি পায়রা নেওয়ার ছলে যুবতী খুল্লনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাতে যৌবনবতী খুল্লনা লজ্জা অনুভব করে।

''সাধু ধরে বালা করে মুখ দেখিছে অহি ছলে
লয্যা পাইল খুলুনা অন্তরে।''[২৫৬]

লজ্জাবতী খুল্লনা বিনয়ী ও বিনম্র চরিত্র। ধনপতি বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করতে জনার্দন পণ্ডিত ইছানী নগরে লক্ষপতির গৃহে উপস্থিত হয়। অপরিচিত অতিথির জন্য জল প্রদান করে খুল্লনা তাকে প্রণাম করে। তখন তার বয়স সাত বছর। বাল্য বয়স থেকেই তার মধ্যে এই সংস্কারগুলি বিদ্যমান। তার যেমন গুরুজন তুল্য জনার্দনের প্রতি শ্রদ্ধা তেমনি সতীন দিদির প্রতি আন্তরিক বিনয়। বিবাহ সম্পন্ন হবার পর পিত্রালয় থেকে আগমনের সময় খুল্লনা মাতা রম্ভাবতীর কাছে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পারিবারিক সংস্কারের পরিচয় লাভ করে।

কিন্তু খুল্লনার দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই বিপদের সূচনা হয়। তার স্বামী রাজা বিক্রমকেশর কর্তৃক বন্দী হলে আরম্ভ হয় সতীন লহনার তার প্রতি রোষযুক্ত বাক্যবাণ। আবার তাকে নিয়ে এদিকে চণ্ডীর ছাগল চরানোর পরিকল্পনা। তার ফলে ধনপতিকে শারী-শুকের জন্য সুবর্ণ পিঞ্জর তৈরী করতে গৌড়ে যেতে হয়। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুল্লনাকে সতীন জ্বালার সম্মুখে পড়তে হয়। খুল্লনা সমূহ পরিস্থিতির কাছে অসহায় চরিত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সে শিক্ষিতা। বিগত রূপ ও যৌবনা লহনা সুন্দরী ও যৌবনবতী খুল্লনাকে স্বামী ধনপতির নাম করে মিথ্যা জাল চিঠি লিখে ছাগল চরাতে আদেশ দেয়। যাতে তার রূপ ও যৌবন নষ্ট হয়। এবং সমাজের কাছে তার কলঙ্ক রটে। কিন্তু সে নিলাবতীর জাল চিঠির হস্তাক্ষর দেখেই সনাক্তকরণ করতে পারে এবং লহনার চক্রান্ত তার কাছে ধরা পড়ে যায়। সে লহনাকে বলে —

''কপট পাতি শুন দিদি লেখিঞাছ তুমি।

লেখিএগছে নিলাবতী চিহ্নিলাম আমি।।''[২৫৭]

লহনার মিথ্যা চক্রান্তের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে। এমনকি এই ঝঞ্ঝাট থেকে অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য সম্পত্তির ভাগ চেয়েছে। মধ্যযুগে কোন নারী চরিত্র বোধহয় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খুল্লনার মত এইরূপ সমাজ-বিরুদ্ধ প্রতিবাদী বাক্য উচ্চারণ করতে পারেনি। সে লহনাকে বলে —

''শুনহ লহনা দিদি তোর সকল নাট।
আমাকে বুঝিএগ দেহ গৃহস্তির বাট।।''[২৫৮]

একথায় তাকে লহনা কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তা সে মুখ বুঝে সহ্য করেছে। অতঃপর, প্রতিবাদের ফণা তুলে নি একবারের জন্যও। কারণ তার কাছে আজ স্বামী-স্তম্ভটি নেই। তাই অসহায় নতজানু হওয়া এবং চোখের জল ফেলা ছাড়া উপায় নেই। সে বলে —

''শুনহ লহনা দিদি তোরে বলি আমি।
মোর বিড়ম্বনা দিদি না করিহ তুমি।।
করিব দাসীর কম্ম জা বলিবা তুমি।
ছেলি চরাইতে দিদি না পারিব আমি।।
লহনার পাও ধরি বলিল খুলনা।''[২৫৯]

স্বামী বর্তমান থাকা খুল্লনাকে লহনা বৈধব্যের বেশ পরিধান করায়। এই অবস্থায় তাকে ছাগল চরাতে যেতে হয়। এই দুঃখে তার মাতা-পিতার কথা মনে পড়ে। কিন্তু তার সতীন গৃহে বিবাহের পর কেউ তাকে একবারের জন্য দেখতে আসে নি। পিতা-মাতা তথা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তার সূক্ষ্ম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তবুও দুঃখে সে ভেঙে পড়ে। সে আক্ষেপ করে বলে —

''পিতা মাতা বিভা দিল জ্বলন্ত আনলে।।
বিভা দিএগ তত্ত নাই কৈল পুনর্ব্বার।''[২৬০]

সেকালের সমাজ ব্যবস্থাই বোধ হয় এমন ছিল। ধনী পরিবারের গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও তাকে পোড়া অন্ন খেতে হয় এবং ঢেঁকিশালায় তার শয়ন মেলে। তার নিরাভরণ ও দুঃখের কথা শুনে ভাই হরিবাণ্যা তাকে অলংকার দিতে বনে আসে। খুল্লনা আত্মসম্মানবোধে, লজ্জায়, দুঃখ-কষ্টে মুখ লুকোতে আড়াল হয়। ছাগল চরাতে চরাতে পরিশ্রান্ত খুল্লনা ঘুমিয়ে পড়ে। তখন চণ্ডীর ছলনায় সমস্ত ছাগল হারিয়ে যায়। একদিকে সতীনের গঞ্জনা, অন্যদিকে ছাগল হারানোর চিন্তায় সে বিপর্যস্ত। এরূপ বিপদে তার মৃত্যু কামনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই সে বনের বাঘ-ভাল্লুকের কাছে নিজ প্রাণ সমর্পন করতে চেয়েছে। সে চণ্ডীর ব্রতদাসী। তাই সকলে তাকে ছেড়ে দেয়। অতঃপর বনে পঞ্চবিদ্যাধরিদের চণ্ডীপূজা করতে দেখে খুল্লনা পরিশুদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত

হয়। তার ফলে চণ্ডীর কৃপায় পুনরায় সে সমস্ত ছাগল ফিরে পায়।

এরপর খুল্লনার জীবনে দুঃখের দিন অস্তমিত হয়। চণ্ডীর ভক্ত খুল্লনার জীবনে সুখের নতুন দিন ফিরে আসে। চণ্ডীর স্বপ্নে ভীত লহনা তাকে অপ্রত্যাশিত আদর যত্ন করে। খুল্লনাকে লহনা বারংবার চুম্বন করে। দুর্বলা দাসীকে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মাছ ও ব্যঞ্জন রন্ধন করে তাকে খাওয়ার জন্য তোষামোদ করা হয়। কিন্তু লহনা এরূপ দয়া দাক্ষিণ্যের কারণ প্রকাশ করে না। বুদ্ধিমতী খুল্লনার কাছে তা বুঝতে দেরী হয় না। তাই খুল্লনা লহনার ভিতরের লুকিয়ে থাকা দুর্বলতাকে উস্কে দিয়ে একটু তীর্যক ভাবে বলে —

''কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব দুখ।
দুর্গার কৃপাতে দিদি মোর হৈল সুখ।।''[২৬১]

লহনা তাতে লজ্জিত হয়। লহনার প্রতি খুল্লনার এই কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এরপর দেবী চণ্ডী ধনপতির ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বপ্নে এলে খুল্লনার কামিনী রূপ বিকাশ পায়। ঘুম ভাঙার পর স্বামীকে না পেয়ে তার যৌবন জ্বালার মাঝে স্বামীর দুঃশ্চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন করে। নিজেকে হতভাগিনীর আখ্যা দিয়ে যন্ত্রণাকে নীরবে আত্মস্থ করে। দেবী চণ্ডী তার সম্মুখে কাক রূপে এসে তার স্বামীর গৃহে ফেরার আশ্বাস দেয়। স্বামী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে স্বীয় শিথিল সৌন্দর্যকে খুল্লনা বেশভূষায় পরিপাটি সজ্জায় সজ্জিত করে নিয়েছে। এই স্থানে খুল্লনার যেমন রূপ সজ্জার পারিপাট্য রয়েছে, সেরূপ রয়েছে তার পতিভক্তি। দীর্ঘদিন পর স্বামীর আগমনে সে বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করে খাওয়ায়। তারপর খুল্লনা ধনপতির সঙ্গে শয্যাগৃহে যায়। শয্যাগৃহে ধনপতির ঘুমন্ত অবস্থায় নাক ডাকার শব্দ শুনে খুল্লনা তার নাক চেপে ধরে। খুল্লনার এই আচরণ কৌতুকাবহ। নিদ্রাভঙ্গের পর ধনপতি তাকে সম্ভোগবাসনা জ্ঞাপন করে। স্বামীর এই অভিসন্ধিকে সে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিবারণ করে। এবং তার অনুপস্থিতিতে সতীন লহনা কর্তৃক স্বীয় দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা আত্মাভিমানের সুরে ও বারোমাস্যার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছে। এই অবস্থায় ধনপতি তার রূপ যৌবনের প্রশংসা করলে খুল্লনা নিজেকে স্বামীর কাছে সঁপে দেয়।

কিন্তু এই মিলনের আনন্দ তার দাম্পত্য জীবনে ক্ষণকালের। অতঃপর তার জীবনে আসে কঠোর পরীক্ষা দেওয়ার পালা। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানা স্থান থেকে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়। বণিক সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন নিয়ে ঘোর কলহ বেঁধে যায়। তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান বিষ্ণু দত্ত ধনপতিকে হেনস্থা করার জন্য সদাগরি পাকে ফেলে স্ত্রী খুল্লনার বনে ছাগল চরানোর ফলে সতীত্ব ভ্রষ্টের দোষ উত্থাপন করে। খুল্লনা যদি সতীত্বের পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে একলক্ষ টাকা দিতে হবে, তবেই তারা তার গৃহে ভোজন করতে পারে। ধনপতি জ্ঞাতির গঞ্জনার

ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছে। কিন্তু খুল্লনা তার সতীত্ব সম্পর্কে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। সে স্বামীকে সর্বদা তার সতীত্ব সম্বন্ধে আত্মস্থ করতে চেয়েছে। কিন্তু ধনপতি শিথিল বিশ্বাসে খুল্লনাকে আভাসে ঈঙ্গিতে সন্দেহ পোষণ করে। খুল্লনাকে সে পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে বলে এবং তাদের লক্ষ টাকা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু খুল্লনা নির্বোধ নয়, সে তাদের অত্যাচার ও শোষণের ফাঁদ সম্পর্কে অবহিত। সে ধনপতিকে বলে —

''বনে খুলনার জ্ঞাতি নল্য কুনজন।
প্রমাদ ভাবিছে প্রভু এহি সে কারণ।।''[২৬২]

সে কঠোর পরীক্ষা দিতে রাজী। সে সতী। নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাতে প্রফুল্লমুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়ায়। খুল্লনা সমাজের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নারী। সে জানে প্রতি বছর এরূপ তার চরিত্র দোষ উত্থাপন করবে এবং ধনপতিকে জ্ঞাতি-কুল নষ্টের ভয় দেখিয়ে তারা সুবিধা ভোগ করবে। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সে জানে তার সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে সমাজ ও পরিবারের গঞ্জনা ক্ষান্ত হবে না। সে ধনপতিকে বলে —

''খুলনা বোলেন তঙ্কা দিবে একবার।
জনমের মত কৈল কলঙ্ক আমার।।
আমি দুষ্টা হব প্রভু তুমি অভাজন।
বচ্ছরে ২ তঙ্কা লবে জ্ঞাতিগণ।।
পরীক্ষা করিতে জদি না দিবে আমারে।
গলে কাতি দিব কিবা মরিব সাগরে।।''[২৬৩]

এখানে খুল্লনা প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী ও প্রতিবাদী চরিত্র।

খুল্লনাকে কঠোর থেকে কঠোরতর সাতটি পরীক্ষা দিতে হয়। তাকে সাজির মধ্যে জলপূর্ণ করে ডুবাতে চেষ্টা করা হয়, লোহার শাবল দগ্ধ করে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করা হয়, সর্প দ্বারা দংশনের ব্যবস্থা করা হয়, দাঁড়িপাল্লায় তুলা ও তাকে তুলে পরীক্ষা করা হয়, ধানের খোলস দ্বারা নৌকা তৈরী করে জলে ডোবানোর চেষ্টা করা হয় এবং শাণিত ক্ষুরের উপর সাতবার খুল্লনাকে হাঁটতে হয়। অবশেষে জতুগৃহ নির্মাণ করে খুল্লনাকে তার মধ্যে রেখে আগুন দেওয়া হয়। কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় এই জতুগৃহ থেকে খুল্লনা সতী আরও উজ্জ্বল হয়ে বের হয়। এবার শত্রুগণ পরাভব মেনে খুল্লনাকে প্রণাম করে। কবি তৎকালীন পুরুষ সমাজকে অত্যন্ত দক্ষতায় নারীর পদস্থলে স্থাপন করিয়ে ছেড়েছেন। কবির কথায় —

''জ্ঞাতি বিদ্যমানে রামা দিল দরশন।

ধরিল সকল জ্ঞাতি খুলনার চরণ।।''[২৬৪]

নারী হিসেবে খুল্লনার এই সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে রামায়ণের সীতার সতীত্ব পরীক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে। খুল্লনার এইরূপ প্রতিস্পর্ধী আচরণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়।

পাশাপাশি খুল্লনা স্বামীপরায়ণ নারী। স্বামীর মঙ্গল কামনা করে সে চণ্ডীর মণ্ডপে যায়। সে শরীর পরিশুদ্ধ করে সূর্য পূজা করে নেয়। এরপর খুল্লনা চণ্ডীর ঘট স্থাপন করে অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর পূজা করে। তার পূজায় চণ্ডী তুষ্ট হয় এবং তার গৃহে আগমন করে। উভয়ের কথা শুনে লহনা স্বামীর কাছে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য পর পুরুষের সঙ্গে খুল্লনার সম্পর্কের কথা জানায়। তাতে ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে চণ্ডীর সেই ঘট লাথি মেরে ফেলে দেয়। এবং খুল্লনাকে ধনপতি চণ্ডীর পূজা ত্যাগ করে শিব পূজা করতে আদেশ দেয়। শিব ভক্ত ধনপতির গৃহে তার স্ত্রী কর্তৃক চণ্ডীপূজার মধ্য দিয়ে একই গৃহে দুই শক্তির বিরোধের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। খুল্লনা পুনরায় দেবীকে আরাধনা করে। কিন্তু দেবী তার ডাকে সাড়া দেয় না। তখন স্বামীর মঙ্গলাকঙ্ক্ষায় খুল্লনা স্বীয় মস্তকের চুল তুলে, পিঠের চামড়া, হাতের দশ আঙ্গুল, জিহ্বা ও দুই কান কেটে দেবীকে প্রদান করে। এখানে তার স্বামীর প্রতি প্রাণাধিক ভক্তি ও অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে।

শ্রীমন্তের জন্মের পর তার স্বামী ভক্তি মাতৃস্নেহে পরিবর্তিত হয়। সে সর্বদা শিশু শ্রীমন্তকে আগলে রাখে। তার দুরন্তপনার অভিযোগ অবলীলাক্রমে সহ্য করে। সে পুত্রের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার বিষয়ে চিন্তিত হয়। স্বামীর কথা মত সে শ্রীমন্তের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। খুল্লনা বলে —

''মুক্ষ হঞা বাড়ে পুত্র সাধু নাই ঘরে।
সাধু আসিঞা মন্দ বলিবে আমারে।।''[২৬৫]

খুল্লনা দাসী দুর্বলাকে দিয়ে পণ্ডিত শ্রীহরিকে গৃহে ডেকে আনে। এবং পুত্রকে সে গুরুগৃহে শিক্ষা লাভের জন্য দেয়। পুত্র গুরুগৃহ থেকে অপমানিত হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে। এদিকে খুল্লনা পুত্র ফেরার সময় অতিক্রম হলে কেঁদে আকুল হয়। সে গুরুগৃহে পুত্রের সন্ধান না পেয়ে তার ব্রাহ্মণী সখীর বাড়িতে যায়। সেখানে শ্রীমন্তকে পাওয়া যায় না। এভাবে সে যত্রতত্র সন্ধান করে বেড়ায় শোকাকুলা মাতার মত। তার এই বাৎসল্যবোধ কৃষ্ণপ্রাণা যশোদার ন্যায়।

''কান্দিয়া আকুল হৈল খুলনা যুবতি।।
এইমতে স্থানে ২ পুত্র তল্বাসিল।''[২৬৬]

অতঃপর শ্রীমন্ত তাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন স্বামীর প্রতি চণ্ডীর বিরূপ ভাবনার কথা

সে বলে। তার স্বামী জীবিত — এই বিশ্বাস তার রয়েছে। তাই সে সতীত্বের রীতি-আচারগুলি এখনও লঙ্ঘন করেনি। এসকল কথা বলে বিচলিত পুত্রকে পিতার সম্বন্ধে আশ্বাস দেয়। এবং সে তার পিতার দেওয়া পত্রটি হাতে দেয়। পুত্রের যাত্রার সময় অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। সেই সঙ্গে সন্তানের পথের বিপদ আশঙ্কা করে মাতা খুল্লনা শঙ্কিত। পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্খা করে চণ্ডী পূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সময় চণ্ডী শ্বেতমাছির ছদ্মবেশে খুল্লনার কানে প্রবাসে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার মন্ত্রণা দেয়। তখন খুল্লনা শ্রীমন্তকে কাছে বসিয়ে স্বীয় দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছে, যাতে পুত্রের প্রতি তার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। পিতাকে পেয়ে শ্রীমন্ত যাতে তাকে ভুলে না যায়, তা আকুল কণ্ঠে প্রকাশ করে। স্বামী ছাড়া তার হৃদয় দুঃখে বুক পাথর হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পুত্রই একমাত্র তার অবলম্বন। তাই সে বলে —

''পুত্র সঙ্গে খুলনা বসিল একঠাই।
দুঃখ সুখে কথা বাছা তোমারে সধাই।।
বিদেশে জাইবে পুত্র আমি বলি তোকে।
পিতাকে পাইঞা পুত্র পাশরিবে মোকে।।
তোর পিতা গেল মোকে বুকে শিলা দিঞা।
তুমি জে বিদেশে জাঅ অনাথ করিঞা।।
পুত্রের সমান ধন ত্রিভুবনে নাই।
উজানীর মধ্যে মোকে কে বলিবে মায়।।''[২৬৭]

তার পুত্র স্নেহ ও পুত্রকে অবলম্বন করে জীবন চালনার বাসনাই বড় হয়ে উঠেছে। এখানে তার স্ত্রীসত্তা একটু শিথিল হয়ে জাগ্রত হয় মাতৃসত্তা। তার এই সত্তার বিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর।

তা সত্ত্বেও শ্রীমন্ত মাতার কাছ থেকে পিতার পত্র নিয়ে সিংহল যাত্রা করে। শ্রীমন্ত পিতাকে নিয়ে উজানী নগরের নদীর ধারে উপস্থিত হয়। স্বামী পুত্র ফিরবার কথা শুনে সে দৌড়ে যায়। কিন্তু সে চণ্ডী প্রণতি করে নৌকা পূজায় ব্যস্ত। শ্রীমন্ত মাতাকে পিতার কথা স্মরণ করাতে পিতার একটি সূক্ষ্ম বস্ত্র খুল্লনার সম্মুখে সনাক্তকরণ স্বরূপ মাটিতে পেতে দেয়। তা দেখে খুল্লনার হৃদয় চকিত হয়, কিন্তু স্বামীর প্রতি দীর্ঘ প্রতীক্ষার আনন্দ প্রকাশ পায় না। সে চণ্ডী পূজা এবং পুত্র ও নববধূকে নিয়েই মত্ত হয়।

''পিতার নেতখানি ভূমে বিছাইল।
তাহা দেখি খুলনা রামা চমকিত হৈল।।
সাধুর নেতখানি খুলনা চিহ্নিঞা।

নেতকে বন্দিল রামা ভূমিতে পড়িঞা।।
দুর্গাকে প্রনতি করি নৌকা পূজিঞা।
পুত্রবধূ খুলনা লইল আলচিঞা।।''[২৬৮]

বস্তুত খুল্লনার চরিত্রে দুটি সত্তার (স্ত্রী ও মাতৃ) বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার সঙ্গে তার চরিত্র গুণাবলী পরিবর্তন ঘটেছে। কবি চরিত্রকে প্রথাগত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন; ঘটনা বা পরিস্থিতির বিপরীত স্রোতে প্রথামুক্তির আস্বাদ খোঁজেন নি।

এবার 'ধনপতি খণ্ড'-এর অপ্রধান চরিত্রগুলির আলোচনায় আসা যাক।

বণিক খণ্ডের **জয়পতি** ও **নিধুপতি** চরিত্রটিও উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি। এই খণ্ডে জয়পতি মানব চরিত্র। সে বণিক এবং উজানি নগরে তার নিবাস। তার স্ত্রীর নাম উর্বশী। পুত্র ধনপতি। আর নিধুপতিও বণিক। তার বাসভূমি ইন্দ্রানী নগরে। তার কন্যার নাম লহনা। উপযুক্ত কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত। তার সঙ্গে জয়পতির কুল-ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয় সঙ্গে। সে তার বিধান দেয়। ব্রাহ্মণ পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ বিচার করে বিবাহের দিন স্থির করে। জয়পতিও তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পুত্রের বিবাহ দেয়। নিধুপতি নিজেই জামাতাকে বরণ করে। কুলের ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র পাঠ করে। কবির ভাষায় —

''নিধুপতি সাধু করে জামতা বরণ।
বেদমন্ত্র উচ্চারিল কুলের ব্রাহ্মণ।।''[২৬৯]

তাতে উচ্চবর্ণের বণিক সমাজে পুরুষ প্রধান আর্য সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কন্যার সুখ-শান্তির চিন্তায় নিধুপতির পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে। সে কন্যার শ্বশুরালয়ে যাত্রায় ব্যাকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি, বিবাহ সভায় কন্যাপক্ষের দোষ ত্রুটি হলে তার ফলশ্রুতি কন্যার উপর বর্তাবে। সকল দিক চিন্তা করে পিতা নিধুপতি জয়পতিকে হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে। এবং বিবাহ রাত্রের সমস্ত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়। কন্যার বিবাহে পিতা নিধুপতির অবস্থা কবি এই ভাবে তুলে ধরেছেন —

''ধনপতির হাতে লহনাক সমপিয়া।
করূণা করিছে সাধু ভূমিতে পড়িয়া।।
জয়পতি হস্ত নিধুপতি ধরে।
বিহাই বিবাহের রাত্রের দোষ ঘাইট খেমিবেন আমারে।।''[২৭০]

নিধুপতির চরিত্র অঙ্কনে কবি বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাতের উপায় স্বরূপ পায়রা উড়ানো বিষয়টি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এসেছে। ধনপতির পায়েরা উড়ানোর আভিজাত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে **জনার্দন ওঝা, হরিয়া ছুতার** ও

কাণ্ডার বুলন চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এরা সকলে ধনপতির সঙ্গ নিয়েছে। বৃত্তিতে তারা নিম্নশ্রেণীর।

''পায়েরা খেলিতে জায়ে সাধু ধনপতি
সঙ্গে ওঝা নড়ে জনার্দ্দন।
হরিয়া ছুতার নড়ে হিরার গড়ণ গড়ে
সঙ্গে ভাই কণ্ডার বুলন।।''[২৭১]

হরিয়া বৃত্তিতে ছুতোর। তার ভাই বুলন। বুলন উচ্চবিত্ত শ্রেণী প্রতিনিধি ধনপতির পথ -প্রদর্শক। উচ্চবিত্তের ধনপতির সঙ্গে ইছানি নগরের ধূলিয়া মাঠে সাক্ষাৎ হয় **হরি দত্ত**-এর। সেও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তার সঙ্গে ধনপতির পায়রা খেলার প্রতিযোগিতা। একলক্ষ টাকা এই খেলায় তারা রাজী করে। কিন্তু হরি দত্ত তাতে পরাজিত হয়। তবুও ধনপতির পায়রাও খুঁজে পাওয়ার সংবাদ হরি দত্তই দেয়। সেই সূত্রে ধনপতি লক্ষপতির দ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার সঙ্গী হয় বুলন। ধনপতির আজ্ঞাবহ সে। ধনপতির কথায় সে লক্ষপতিকে ডাকতে যায়। এই ভাবে উচ্চশ্রেণীর মানুষের কথা বলতে গিয়ে অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে **লক্ষপতি** বণিক। সে ধনপতির খুড়তুতো শ্বশুর। জামাইয়ের প্রেরিত বার্তায় সে তৎক্ষণাৎ তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধনপতি জল প্রার্থনা করলে দেবীর ছলনায় লক্ষপতি তা প্রদানে অক্ষম হয়। কিন্তু সে ধনপতিকে পান দিয়ে আপ্যায়ন করতে ত্রুটি করে না। যুবতী কন্যা খুল্লনাকে দেখে ধনপতি তাকে উপযুক্ত কন্যার বিবাহ সম্পর্কে অনুযোগ করে। তাতে লক্ষপতির মাথা হেট হয়ে যায়।

''ই কথা শুনিয়া সাধু হেট কৈল মাথা।
উপযুক্ত কন্যার নামে সাধু পাইল ব্যাথা।''[২৭২]

যুবতী কন্যার বিবাহ না দিতে পারলে লক্ষপতির মত উচ্চবর্ণের পিতাকেও সামাজিক গঞ্জনার শিকার হতে হত। পিতৃহৃদয়ের দুর্বলতা লক্ষ্য করে ধনপতি তার উদ্দেশ্য উত্থাপন করে। কিন্তু পিতা লক্ষপতি কন্যার বিবাহ সতীনের গৃহে দিতে দ্বিধান্বিত। সে ধনপতিকে বলে — ''কি বোল বলিলা বাপু ধড়ে থুইয়া জীউ।''[২৭৩] একদিকে তার পিতৃসত্তা জনিত কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং অন্যদিকে সামাজিক কুলমর্যাদার দিক থেকে বহুবিবাহের নীরব সম্মতিতে লক্ষপতি চরিত্রটি জীবন্ত। এই অবস্থায় সে স্ত্রী রম্ভাবতীর মনোবাঞ্ছা জানা শ্রেয় বলে মনে করে। শেষ পর্যন্ত লক্ষপতি ধনপতির সঙ্গে কন্যার বিবাহে সম্মতি দেয়।

'বণিক খণ্ডে' **বিক্রমকেশর** উজানি নগরের রাজা। তার কন্যা জয়াবতী। এই রাজ্যেই বসতি ধনপতি নামে বণিকের। ধনপতির সঙ্গে তার পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের কথা বড়

হয়ে উঠেছে। ধনপতিকে বিক্রমকেশর 'আঁটকুড়া' অপবাদ দেয়। সমাজ ও রাজ্যে আঁটকুড়া থাকা শুভ ও কল্যাণ কর্মে ব্যাঘাত ঘটায় — এই ছিল তখনকার ভাবনা। এই বিশ্বাস সকলের মধ্যে চূড়ান্ত। তাই রাজার অপবাদ নিবারণের জন্য ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করে। কিন্তু তার দ্বিতীয় বিবাহ রাজা বিক্রমকেশরের আজান্তে হওয়ায় সে তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয় এবং ধনপতিকে কারারুদ্ধ করে। কিন্তু ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত দক্ষিণ পাটনের রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করে ফিরলে বিক্রমকেশর তার আভিজাত্যকে টিকিয়ে রাখতে তার কন্যা জয়াবতীকেও তার সঙ্গে বিবাহ দেয়। এক্ষেত্রে রাজা বিক্রমকেশরের মধ্যে একই সঙ্গে সামাজিক বহুবিবাহ প্রথা এবং আভিজাত্যের মহিমা ভাস্বর।

বিক্রমকেশরের পাশাপাশি রাজা **শ্রীবৎস**-এর কথা পাওয়া যায়। সে কোন্ রাজ্যের রাজা কাব্যে তাঁর কোন উল্লেখ নেই। শারী-শুক নামক পাখি দুটি এই রাজা কর্তৃক পালিত হয়। সে শনি মহারাজের দ্বারা ছলনা শিকার হয়। শনির ছলনার কথা শারী স্মরণ করে দিলেও সে তার কথা অমান্য করে সন্ন্যাসীরূপ শনির সামনে উপস্থিত হয়। শ্রীবৎসের উপর শনি কামবাণ নিক্ষেপ করে। কামপ্রবৃত্ত হলে রাজার একাদশী ব্রত লঙ্ঘন হয়। সেই পাপে শনির দৃষ্টি লাগল তার উপর। তার ফলে রাজা শ্রীবৎস যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেদিকেই ধনলক্ষ্মী অদৃষ্ট হয়। এখানে লোক প্রচলিত বিশ্বাস তার চরিত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় প্রজাবৎসল রাজা শ্রীবৎস প্রজার কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে রাজ্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রাজা দর্জি এনে কাঁথা তৈরী করে তাতে সমস্ত ধন পরিপূর্ণ করে এবং স্ত্রী চিন্তাবতীও শারী-শুয়াকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু খেয়া পারাপারের সময় রাজা শ্রীবৎস পুনরায় শনির ছলনার শিকার হয়। তাতে শারী-শুক সহ সমস্ত ধন হারায়। নীঃস্ব রাজা বাধ্য হয়ে পুনরায় রাজ্যে ফিরে আসে।

অভিজাত রাজা চরিত্রের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রগুলিও তার জীবিকায় সচল হয়ে উঠেছে। সেই নিম্নশ্রেণী ব্যাধ চরিত্র হল **উতু** ও **পাতু** নামে দুই ভাই। শারী-শুকের ধরা পড়া এবং কাহিনী নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা রয়েছে। তারা দুই ভাই বনে পাখি শিকার করে এবং বাজারে তা বিক্রি করে। তারা শিকারজীবী। কবির ভাষায় —

''উতুপাতু নামে ব্যাধ দুই ব্যাধ ছিল।
পক্ষ মারিতে দুহে সাজিতে লাগিল।।''[২৭৪]

শিকারের উপর তাদের সংসার অতিবাহিত হয়। তারা শিকারে বিচক্ষণ। তাতে শারী-শুয়া পক্ষিদ্বয় নিজেদের কথা ভেবে কাঁদতে থাকে। শারী পক্ষী নিজেকে উতু ও পাতুর হাতে আত্মসমর্পণ করে। শুয়াকে তারা আহার দ্বারা খাঁচায় বন্দী করে। শারী শুয়ার ক্রন্দনে ব্যাধদ্বয়ের সহানুভূতি জাগ্রত হয়। পক্ষীদ্বয়ের কথামতো উতু ও পাতু তাদেরকে রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবারে নিয়ে যায়।

শারী-শুয়া ব্যতীত তারা বিভিন্ন প্রকার পাখি বিক্রি করে। তাতে নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে উঠে।

অন্যদিকে, উচ্চবিত্ত শ্রেণীও সামাজিক রীতির কাছে অসহায়। তার প্রতিভূ **হরি বান্যা** চরিত্রটি। সে খুল্লনার ভ্রাতা। রম্ভাবতীর একমাত্র পুত্র। মায়ের ক্রন্দনে তার হৃদয় ব্যাকুল। তাতে সে গুরুর গৃহ থেকে বাড়ি ফিরে আসে। মায়ের কাছে সে বোনের সমস্ত দুঃখের ঘটনা শোনে। তার জন্য অলংকার নিয়ে বনে উপস্থিত হয়। ভ্রাতা হিসাবে তার সাহস হয়নি সামাজিক রীতির কঠোর বন্ধন অস্বীকার করে খুল্লনাকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাকে বাধ্য হতে হয়েছিল সমস্ত অলংকারাদি রেখে আসতে। খুল্লনার সামাজিক কোন খারাপ অপবাদ রটনার ভয়ে সম্মুখে না গিয়ে দূর থেকেই সমস্ত কিছু রেখে চলে আসে। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতি বন্ধনে মানুষ কতটা অসহায় তা পরিস্ফুট হয়েছে।

খুল্লনার দুরবস্থা অতিক্রম করার সূচক হিসাবে রাজা **ধনেশ্বর** চরিত্রটির আগমন। সে গৌড়ের অধিশ্বর তার রাজ্যে অবস্থানরত বণিক ধনপতি। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে ধনপতি গৃহাভিমুখী হওয়ার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে রাজা ধনেশ্বর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সে ধনপতির জন্য স্বর্ণপিঞ্জর তৈরী করতে সাতজন স্বর্ণকারকে ডাকে। ধনপতির সঙ্গে রাজা মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাকে গৌড়েই থেকে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু ধনপতি খুল্লনার রূপসৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত। এই অবস্থায় রাজা ধনেশ্বর নারী জাতিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিম্ন অবস্থানকে ধনপতির সম্মুখে তুলে ধরেছে। তার কাছে নারী পুরুষের জীবনে সাময়িক প্রয়োজনের বস্তু এবং সকলের ভোগ্যা। তাই ধনপতিকে সে বলে —

> ‘‘নারীর কারণে ভাবে ধিক তার জী।।
> এক হিত কথা শুন মিতা মহাশয়।
> নারীলোক আপনার কোন যুগে নয়।।
> পর পুরুষের আশ করে সর্ব্বথায়।
> নারী কি আপন হয় কুন শাস্ত্রে কয়।।’’[২৭৫]

এমনকি, সে ধনপতিকে তৃতীয় বিবাহ করার কথা বলে। রাজা ধনেশ্বর চরিত্রের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার ব্যাপকতা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অস্তিত্ব সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বণিকরা সমাজে অর্থশ্রেষ্ঠ। মানিক দত্ত এই বণিক শ্রেণীর অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করেছেন। ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ঘটনাকে পটভূমিকা রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয় বিভিন্ন গ্রামের ক্ষমতাসম্পন্ন বণিকরা। তারা হল **নীলাম্বর দাস**, **রাম রায়**, **সনাতন**, সপ্তগ্রামের **বিষ্ণু দত্ত**, **শঙ্খ দত্ত**, চাঁপালির **চাঁদ সদাগর**, দিঙ্গীপের **হরিহর** ও ইছানীর **লক্ষপতি** উল্লেখযোগ্য।

এদের মধ্যে সমাজ-প্রধান চাঁদ সদাগর। চাঁদকে ধনপতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত বণিকদের মধ্যে কুল শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে তার কপালে চন্দন ও গলায় মালা দেয়। তাতে প্রতিবাদ করে নীলাম্বর দাস। সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের লড়াই চললেও নীলাম্বরের পারিবারিক ব্যবসা উচ্চমানের নয়। চাঁদ সদাগর নীলাম্বরকে বলে —

''তোর বাপ লবন বেচে চক্ষ করে টেড়া।
ফাএর কারণে লোকসনে করিত ঝগড়া।।''[২৭৬]

নীলাম্বরের পাশাপাশি অন্যান্য বণিকরাও কুলশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। এই নিম্নমানসিকতার সঙ্গে তারা সমাজের অধিকর্তা তারও বিবৃতি পাওয়া যায়। খুল্লনার ছাগল চরানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। তারা ধনপতি হেনস্থা করতে তার স্ত্রী খুল্লনার সতীত্ব নষ্টের অপবাদ দেয়। অপবাদ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় একলক্ষ টাকা ঘুষ। নতুবা ধনপতির গৃহে তারা অন্নগ্রহণ করবে না। বণিক শ্রেণীর মানসিকতা, অধঃপতন, ক্ষমতার নামে জুলুমের চিত্র পরিস্ফুটনে চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক অবস্থার পরিচয় প্রদানে **গোপাল** চরিত্রটির ভূমিকা অসামান্য। সে চোর। দেবী চণ্ডীর আদেশে রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবার থেকে চন্দন চুরি করে। সে চণ্ডীর অনুগত ভক্ত। রাজসভার প্রয়োজনে চন্দনের জন্য ধনপতির সিংহল যাত্রা। কাহিনীর ধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গোপাল চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য।

বণিক খণ্ডে অপ্রধান শিশু চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **ভোলা**। সে যাইট দত্তের পুত্র। তার সঙ্গী ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের বাল্য বয়সের চাঞ্চল্য ও দুরন্তপনা প্রকাশে ভোলার গুরুত্ব রয়েছে। শ্রীমন্ত কর্তৃক ছোঁড়া ধুলো তার চোখে গিয়ে লাগে। তাতে ভোলার কান্না ও তার পিতা যাইট দত্তের অভিযোগ অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীমন্তের বাল্য শিক্ষক তথা গুরু হল পণ্ডিত **শ্রীহরি**। সে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাকে দাসী দুর্বলা ডেকে আনে শ্রীমন্তকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য। প্রথমে সে তাকে শুভক্ষণ গণনা করে হাতে খড়ি দেয়। তার আলয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া হয়। শিষ্যদের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সুবর্ণমোহর নেওয়া হত। চণ্ডীর ছলনায় শ্রীমন্তের হাতের খড়ি মাটিতে পড়লে তা গুরুকে তুলতে আদেশ করে। তাতে শ্রীহরি ক্রোধ প্রকাশ করে এবং শ্রীমন্তকে জারজ সন্তান বলে গালাগাল করে। কবি বলে — ''সাধুকে পণ্ডিত জদি জারূয়া বলিল।''[২৭৭] শ্রীহরি চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার কারণ অনুসন্ধান করা যায়।

সিংহল বা দক্ষিণ পাটনের রাজা **শালবান**। বণিক খণ্ডের চরিত্র সে এবং তার কন্যা

সুশীলা। তার সঙ্গে শ্রীমন্তের বাণিজ্যিক কারণে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমন্ত তাকে নানা ভেটজাত দ্রব্যের সঙ্গে নারকেল প্রদান করে। কিন্তু রাজা নারকেল যে ফল সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাই, শ্রীমন্তকে কূটচক্রান্তকারী ভেবে সন্দেহ করে। তার মনে হয়েছে বিষ ফল দিয়ে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। শ্রীমন্তকে সেই নারকেল খাওয়ানোর পর সেই অজানা বস্তুটি যে অনিষ্টকর নয় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

''রাজার কথা শুনি সাধু নারিকল খাল্য।
নারিকল খাএগ দুই প্রহর হইল।।
প্রত্তয় পাইএগ রাজা শ্রীমন্তকে বলে।
বুঝিলাম বিষ নাই নারিকেলের ফলে।।''[২৭৮]

অতঃপর শ্রীমন্ত কমলে কামিনীর কথা উত্থাপন করলে শালবান তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। যদি সত্য হয় তবে সে শ্রীমন্তকে অর্ধ রাজ্য ও কন্যা দানের শর্ত করে। শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দেখাতে ব্যর্থ হলে তার সমস্ত বাণিজ্যিক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। শালবান মশানে তার মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দেয়। শ্রীমন্তকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডীর আগমন এবং শালবানের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা শালবানের শিবভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের দেওয়া শক্তিশেল দ্বারা রাজসেনারা দেবীর দৈত্যদের নাশ করে। বলা হয়েছে —

''শালবানকে শিব শক্তিশেল দিয়াছিল।
সেই শেল রাজসেনা মারিতে লাগিল।।''[২৭৯]

যুদ্ধে সেনাদের মৃত্যুতে শালবান শোকাহত। এই অবস্থায় তার মহাপাত্র দামোদর তাকে দেবীর স্মরণ নিতে বলে। পরিস্থিতির চাপে শিব ভক্ত শালবান অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দেবীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে। চণ্ডীর ভক্ত শ্রীমন্তকে কন্যা সুশীলার সঙ্গে বিবাহ দেয় এবং তাকে অর্ধরাজ্য সহ সাতটি নৌকা, হাতি ঘোড়া ও বহুমূল্যবান সম্পত্তি প্রদান করে।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছবি অধিক পরিমাণে রয়েছে। সেই পরিবারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা কবি মানিক দত্ত বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন। পরিবারের পরিচায়িকা দাসী থেকে শুরু করে তুক্-তাক্ বশীকরণে পারদর্শি কেউ কবির চোখ এড়ায়নি। তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় এই ধরনের চরিত্রগুলিকে সচল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের এরূপ অপ্রধান নারী চরিত্র **দুর্বলা**। বণিক ধনপতির পরিবারে সে দাসীবাঁদীর কাজ করে। ধনপতির মুখে তার প্রথম 'কিঙ্করী'র পরিচয় পাওয়া যায়। লহনার সে সহচরী। লহনার কুট চক্রান্তে তার সহযোগিতা যথেষ্ট ছিল। পরিবর্তনশীল অবস্থায়ও তার চরিত্রের ভূমিকা

পরিবর্তন হয়নি। এরূপ নারী চরিত্র হিসেবে তার গুরুত্ব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অপরিসীম। দুর্বলা লহনার সহকারী চরিত্র। সতীনের সমস্যা নিবারণের জন্য লহনার নির্দেশে সে নিলাবতীকে ডেকে আনে। পাশাপাশি সে খুব চতুরা ও তোষামোদকারী চরিত্রও বটে। লহনা সংসারে জ্যেষ্ঠ গৃহবধূ। সুতরাং তার ক্ষমতা খুল্লনার তুলনায় অধিক। এই অবস্থায় কীভাবে লহনার মন জয় করা যায় তার কৌশলে দুর্বলা দক্ষ। তাই লহনার সপক্ষে তোষামোদ করে সে খুল্লনাকে বলেছে —

''জদি বা খুলনা তোকে সতিনীএ মারে।
কে করিবে রক্ষা তোরে সামী নাই ঘরে।।''[২৮০]

এখানে সে নামে দুর্বলা হলেও কৌশলে সবলা। সে প্রসঙ্গান্তে রামায়ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে বলেছে যেমনি রামের আজ্ঞাতে সীতাকে বনবাসী হতে হয়েছিল তেমনি লহনার আজ্ঞাতে খুল্লনাকে বনবাসী হতে হবে।

''পুন রামায়ণ কিছু শুন ইতিহাস।
রামের আজ্ঞাতে সীতা গেল বনবাস।।
তোকে হিত খুলনা বলিলাঙ্ সকলি।
সতীনের আজ্ঞামত বনে চরাও ছেলি।।''[২৮১]

এখানে দুর্বলা 'বাঁশের চেয়ে কন্‌চি দঢ় বেশী' -র মত আচরণ করেছে। লহনার গৃহক্ষমতা যেন দুর্বলাই অধিকার করে নিয়েছে। দুর্বলের উপর দুর্বলা এখানে অতি সবল।

দুর্বলার কুটবুদ্ধি থাকলেও নারী হয়ে সে অন্য নারীর দুঃখে লহনার মত মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি। সে খুল্লনার দুঃখের কথা তার বাপের বাড়ি প্রেরণ করে। সে সময় সে একবারের জন্যও লহনার দ্বারা প্রতারণার কথা ভাবে নি। যদিও পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে তোষামোদ করে। কিন্তু আড়ালে তার নারী হৃদয়টি অন্য এক নারীর কষ্টে একটু সময়ের জন্য হলেও কেঁদে ওঠে। তার জন্যই হয়তো সে খুল্লনার দুঃখের কথা নির্দ্বিধায় তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দেয়। সে খুল্লনার কথামত তার মাতা রম্ভাবতীর কাছে দুঃখের বার্তা নিয়ে চলে যায়। অতঃপর দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে লহনা ভীত। তাই খুল্লনাকে ভালো মন্দ রান্না করে খাওয়াতে চায় লহনা। তার জন্য রন্ধন দ্রব্যসামগ্রী লহনার কথা মত দুর্বলাই যোগাড় করে। দুর্বলা তবুও আদেশ মান্য করতে বাধ্য। সেও হয়তো খুল্লনার প্রতি শ্রদ্ধাবশত।

''দাসী দুবলা শীঘ্র দ্রব্য আনি দিল।
লহনা রসইশালে রন্ধনে বসিল।।''[২৮২]

এরপর দুর্বলা চরিত্রের পূর্ণ পরিবর্তন হয়। ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রের পরিবর্তন — এটা স্বার্থ সর্বস্ব মানুষের স্বাভাবিক গুণ। দুর্বলার ক্ষেত্রে তা অগ্রাহ্যের নয়। ধনপতির

কাছে লহনার স্থান কমতে থাকলে দুর্বলাও নিজেকে সম্পূর্ণ খুল্লনার দিকে সরিয়ে নেয়। তার কুটবুদ্ধি সুবুদ্ধিতে পরিবর্তিত হয়। ধনপতি দীর্ঘদিন পরে ফিরে আসার বার্তা দুর্বলাই খুল্লনাকে দেয়।

''দাসী বোলে খুলনা কি কর বসিঞা।
সদাগর আল্য হের দেখহ আসিঞা।।''[২৮৩]

এবং খুল্লনার গর্ভাবস্থায় সমস্ত বাইরের কাজগুলি দুর্বলা খুব আনন্দ সহকারে করে। গর্ভবতী খুল্লনার জন্য বিভিন্ন প্রকার শাড়ি সংগ্রহ করা এবং আইয়গণকে খবর দেওয়া, সন্তান প্রসবকালে দাইকে ডেকে আনা প্রভৃতি সমস্ত কাজই করেছে। এমনকি শ্রীমন্তের শৈশব কালে দেখভালের দায়িত্বও দুর্বলার উপর বর্তায়। বস্তুতঃ দুর্বলা এখন আর লহনার সহচরী নয়, সে খুল্লনার সহচরী। তার মত দাসী চরিত্রের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। এই রূপ বাস্তব চরিত্রের সংখ্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অল্পই পাওয়া যায়। কবির পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে এধরনের চরিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হত না, দুর্বলা তারই প্রমাণ।

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে অপর একটি অপ্রধান অথচ প্রাণবন্ত নারী চরিত্র **নিলাবতী**। সে লহনাদের প্রতিবেশী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। লহনা তাকে 'সই' হিসেবে মান্য করে। লহনার দাম্পত্য জীবনে সতীন সমস্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে কাব্যে তার আগমন। চরিত্রটি কাহিনীতে জটিলতা আনতে ও উপভোগ্য করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

নিলাবতী বশীকরণে পারদর্শী। লহনা স্বামী ধনপতিকে বশ করবার জন্য নিলাবতীকে ডেকে আনে। লহনার রূপ-যৌবন বিগতপ্রায়। ফলে তার প্রতি স্বামীর অবহেলা। এই দাম্পত্য সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য লহনাকে নিলাবতী স্বামী বশীকরণে উপায় উত্থাপন করে। নিলাবতীর বশীকরণের জন্য যা যা প্রয়োজন কবি তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন বাস্তব অভিজ্ঞতায়। মানিক দত্ত বাস্তবের মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত স্থান থেকে তাকে তুলে এনেছেন। নিলাবতীর বশীকরণ প্রক্রিয়াটি এরূপ —

''গাছের কথা লহনাকে বলে নিলাবতী।/ হাট হৈতে কিনি আন এক মূল্যের বাতি।।
শশানের সরিষা আর হাএ হামলা।/ ভরন হাটের লাগে এক মুঠি ধুলা।।
প্রথম হাটের সই লাগে গুয়া পান।/ প্রথমে জে অন্ন খায় তার লাগে ধান।।
খঞ্জনের হাড় লাগে আর অঙ্গের মলা।/ সাত কুপের পানি লাগে তেপথির ধুলা।।
অন্ন সহিত এই গাছ সামীকে খাওাবে।/ প্রাণের অধিক সামী তোমাকে জানিবে।।''[২৮৪]

শুধু স্বামী বশীকরণ নয়, লহনার সতীনের রূপ-যৌবন কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তারও ঔষধ দেয়।

''গাছ দিঞা বুড়ি করাইব খুলুনাকে।
সেইটা গাছের কথা বলি সই তোকে।।
তৈলের মধ্যেতে সই দিহ কিছু হিঙ্গ।
তৈলতে দিহ মধু য়ার সুয়াম সিঙ্গ।।
তৈল পাক করি তাতে দিহ কানাকড়ি।
এহি গাছ খাওালে খুলনা হবে বুড়ি।।''[২৮৫]

এসকল কাজে নিলাবতীর পরিপক্কতা অভাবনীয়; বশীকরণে তার জুড়ি নেই।

নিলাবতী শুধু বশীকরণে পারদর্শী নয়, সে যথেষ্ট শিক্ষিতাও বটে। তার চিঠি লেখার কৌশল লক্ষণীয়। কুটবুদ্ধিতে সে তৎপর। সে ধনপতির হয়ে খুল্লনার সর্বনাশের চিঠি লেখে। নিলাবতী লেখে —

''স্বস্তি য়াগে লেখিয়া লেখিল ধনপতি।
সকল মঙ্গলা লয় লহনা যুবতী।।
বচ্ছর রহিব গোড়ে পঞ্জর গড়িতে।
মোর আজ্ঞা লহনা পাহিল লিপিমতে।।''[২৮৬]

তার চিঠির সহায়তায় লহনা খুল্লনার সমস্ত অলংকার ছিনিয়ে নিতে পারে এবং তাকে দিয়ে ছাগল চরাতে বাধ্য করে। প্রতিবেশী গৃহে সতীন কলহে যেকোন ভূমিকা নিতে তার দ্বিধা নেই। এরূপ নিলাবতীর মত কুটনি চরিত্রকে বাস্তবের ধুলো-মাটি সহ তুলে এনেছেন। ফলে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি অপ্রধান কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র **সুশীলা**। সুশীলা নিলাবতীর মত দরিদ্র নয়। সে সিংহল রাজ শালবানের কন্যা। মাতা নিলারাণী। সুশীলাকে কবি প্রথাগত কাহিনীর জন্য কাব্যে এনেছেন। তার ফলে চরিত্রটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পরিধি পায়নি।

রাজা শালবানের কন্যা সুশীলাকে কমলে-কামিনীর শর্ত স্বরূপ দানে শ্রীমন্তকে দেওয়া হয়। শ্রীমন্ত তাকে বিবাহ করে। সেখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার ফলে তার নিজস্ব ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করি না। কিন্তু তার সাজ-সজ্জার চাকচিক্য ও রুচিবোধ রয়েছে। শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহে সুশীলার রূপসজ্জা তার প্রমাণ। কবির কথায় —

''গৃহে থাকি সুশীলা করিছে নানা বেষ।
বান্ধিল বিচিত্র খোপা আচুড়িয়া কেশ।।
কেশ বান্ধি বেষ কৈল পহ্নিলেন শাড়ী।

কপালে সিন্দু পহ্রে কন্নে পহ্রে কড়ি।।
নয়ানে কজ্জ্বল পহ্রে বেসর নাসাতে।
গলে হার বাহে তার শঙ্খ পহ্রে হাতে।।
সুশীলা পহ্রিল অঙ্গে নানা অলংকার।
চন্দ্র জিনিঞা রূপ হইল সুশীলার।।''[২৮৭]

সুশীলা অত্যন্ত সুন্দরী। তার বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহ রাতে শ্রীমন্ত মায়ের স্বপ্ন দেখে এবং দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়। অল্প বয়স্কা সুশীলা তার স্বামীকে প্রবোধ জানাতে পারে না। কিন্তু মায়ের কাছে তার কোন কথা বলতে অসুবিধা হয় না। তাই মাকে বলে — ''স্বপ্ন দেখিঞা সাধু দেশে জাইতে চাহে।।''[২৮৮] তখন সুশীলা বাধ্য হয়ে স্বামীকে সিংহলে থাকবার জন্য বারমাসের সুখের কথা বলে। যদিও তার বারমাসের কাহিনীর মধ্যে কোথাও একটা মনোবেদনার কথা রয়েছে। ফুল্লরা ও খুল্লনার মত সুশীলার বারমাস্যা নিখাদ দুঃখের কাহিনী নয়। বরং স্বামীকে নিয়ে সুখ ভোগ করার অধীর আগ্রহের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে।

সুশীলা খুল্লনার মত দুর্গার ব্রতদাসী। ধনপতির সঙ্গে সিংহলে যাত্রাকারী লোকজন মৃত, কিন্তু ধনপতি বেঁচে যাওয়ায় সে ধনপতির জন্য চিন্তিত। শ্বশুরের সমূহ বিপদে ও মান-সম্মান রক্ষার জন্য সে দেবীর স্তুতি করে। তার স্তুতিতে শ্বশুরের মান রক্ষা হয় এবং হারানো সকল ফিরে পায়। স্বামী গৃহে এসে শ্রীমন্তের দ্বিতীয় বিবাহে সে ভেঙে পড়েছে। সতীন সমস্যার নিদারুণ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য আগেই সে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে। সতীনের তুলনায় বৈধব্য বেশ তার কাছে শ্রেয়। কবির কথায় —

''বিবাহের কথা জদি সুশীলা শুনিল।
খুলিঞা হস্তের শঙ্খ ভাঙ্গিঞা ফেলিল।।''[২৮৯]

সুশীলার এই আচরণ তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। তাকে রাজকন্যার পরিচয়ের তুলনায় বাস্তব নারীরূপে চিত্রাঙ্কনে মানিক দত্ত অধিক পারঙ্গম দিয়েছেন।

বণিক খণ্ডের অপ্রধান নারী চরিত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **উর্বশী**। তার স্বামী জয়পতি এবং তাদের নিবাস উজানী নগরে। উর্বশীর একমাত্র কন্যা সন্তান লহনা। তবে তার মাতৃত্বের রূপ প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করা যায় না। এই খণ্ডের আর একটি অপ্রধান নারী চরিত্র হল **রম্ভাবতী**। রম্ভাবতী লক্ষপতির স্ত্রী এবং খুল্লনার মাতা। তাদের নিবাস ইছানি নগরে। সে খ্যাতিবান বণিক গৃহের বধূ। কন্যাকে সতীনের সংসারে বিবাহ দেওয়ার প্রসঙ্গে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লক্ষপতি কন্যাকে সতীনের সংসারে বিবাহ দেওয়ার বিষয়ে মতামত জানতে আসে স্ত্রী রম্ভাবতীর কাছে। রম্ভাবতী সামাজিক রীতির ঐতিহ্যকে লক্ষ্য করে আপাত সম্মতি দিলেও বাল্যবিবাহ ও

সতীন সমস্যার বিপক্ষে বলে —

''পুন রম্ভাবতী বলে পণ্ডিতের তরে।
প্রাণতুল্য বাছা দিব সতীনের ঘরে।।''[২৯০]

এভাবে নিরুপায় মাতা তার হৃদয়ের ধনস্বরূপ কন্যাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছে। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কব্যে রম্ভাবতী সেই নিরুপায় মাতার উদাহরণ। তার চরিত্রে বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অভিজ্ঞতা সে কন্যা বিদায়ের সময়ে তুলে ধরেছে। সে কন্যা খুল্লনাকে শ্বশুরালয়ে যাত্রার পূর্বে সতীনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার সম্পর্কে কয়েকটি দিক সচেতন করে দেয়। সে জানে সতীনের সংসার কন্যার কাছে অপ্রতিরোধ্য। তাই সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির ঝড় নেমে আসবে। তার মতে সতীনের কথা মত চলাই শ্রেয়। আবার কন্যাকে স্মরণ করে দেয় যে, ধনপতির মত প্রতিপত্তি সম্পন্ন বণিকের গৃহে আত্মীয় স্বজন সর্বদাই আসবে, নববিবাহিত কন্যার তাদের সম্মুখস্থ হওয়া দৃষ্টিকটু বিষয়। রম্ভাবতী কন্যাকে সমাজ-পরিবার সচেতন করার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাকেও পরোক্ষভাবে বলেছে। কন্যাকে রম্ভাবতী বলেছে যে, সকালে গৃহের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করে স্নানে যেতে। স্নানের সময় বাইরের অপকীর্তিকারী, দুশ্চরিত্র, ইন্দ্রিয় দুর্বল মানুষের থেকে সচেতন থাকতে বলেছে। স্নানের পর শুদ্ধ হয়ে রান্নার পর পরিবারের সকলের খাওয়া হলে উচ্ছিষ্ট সে খাবে।

''রম্ভা কান্দিয়া বলে শুনহ খুলনা।
ভালমতে মানাইহ সতিন লহনা।।
ইষ্টমিত্র সাধুর আসিবে সর্ব্বজন।
তার আগে তুমি না ভাণ্ডাবে সর্ব্বক্ষণ।।
গৃহে বাসি কম্ম করি স্নানকে জাইবে।
চতুর্দিগে দেখি তুমি স্নান করিবে।।
সকলিকে খাওাইহ করিয়া রন্ধন।
অবশেষে জেবা পায় করিহ ভোজন।।''[২৯১]

এভাবে রম্ভাবতী মধ্যযুগে গাহর্স্থ জীবনে বিবাহিত নারী কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং তা থেকে কন্যাকে পূর্ব থেকে সচেতন করে দেয়। সেই সঙ্গে একটি নারী তার দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিকে বজায় রাখতে কীভাবে নিজেকে সঁপে দেয় তার পরিচয়ও রয়েছে। রম্ভাবতীর এত সচেতনতার পরও কন্যাকে সতীনের ঘোরাটোপ থেকে রক্ষা করতে পারল না। কন্যা খুল্লনা সতীন লহনার চক্রান্তে বৈধব্য ধারণ করে এবং ছাগল চরাতে বাধ্য হয়। একথা দুর্বলা দাসীর মুখে শুনে রম্ভাবতীর মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে। পুত্র হরিকে দিয়ে কন্যার পোশাক-পরিচ্ছদ ও

অলংকার প্রেরণ করে। কন্যার বিবাহের পর কন্যাকে দেখতে যাওয়া এবং তার সমস্যার কথা জানা সহজ ছিল না মধ্যযুগে। কেবল দূর থেকে সন্তানের দুরবস্থা শুনে দগ্ধ হত মাতা। মধ্যযুগের সেই অসহায় মাতা রম্ভাবতী।

ধনপতির বিবাহে উপস্থিত নামহীনা নারীরাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা পিষ্ট। তারা তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছে ধনপতির সুদর্শন রূপ দেখে। তারা হল সধবা যুবতী, বিধবা যুবতী ও বৃদ্ধা সধবা প্রভৃতি। এসকল নারীরা তাদের পতিনিন্দার মধ্য দিয়ে নারীর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে কতটা অমর্যাদার সঙ্গে দিন কাটায় তার চিত্র তুলে ধরেছে। প্রথমে একজন সধবা যুবতী নারী বলে যে, তার স্বামী বৃদ্ধ ও কানে শোনে না। যুবতী নারীর মনের চাহিদা অনুভব করতে তার স্বামী অসমর্থ। আবার কারো স্বামী সারা বছরের যক্ষা আক্রান্ত, কারো স্বামীর পিঠে রয়েছে কুজ। এইরূপ স্বামীর প্রতিও তারা পতিপরায়ণতা দেখিয়েছে। স্বামীর জন্য প্রতিদিন শাক, সুকুতার পরিবর্তে কোন শক্ত খাবার রান্না করলে তাকে পিঁড়ির প্রহার সহ্য করতে হয়।

‘‘এক জুবতী বলে পতির নাই দরশন।
শাক সুকুটা বিনে না করে ভোজন।।
একদিন অন্নবেঞ্জন দিড় করি রান্ধি।
মারয়ে পীড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি।।’’[২৯২]

শুধু তাই নয়, বিধবা যুবতী ও সধবা বৃদ্ধাদের কথাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে। আশি বছরের সধবা বৃদ্ধারও মনের সখ-আহ্লাদ শেষ হয়ে যায়নি। তারও যুবতী সাজার সখ রয়েছে। সে ধনপতিকে দেখতে যাওয়ার আগে চোখে কাজল এবং চুল শক্ত করে বেঁধে দুই নাতিনীকে নিয়ে যাত্রা করেছে। যুবক ধনপতিকে দেখে তার হৃদয় দগ্ধ হয়েছে। তার মত হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং অপূর্ণ মনোবাঞ্ছার যন্ত্রণা নাতিনীরা যাতে না পায়, সেই জন্য তাদেরকে ধনপতির কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছে। এই সকল নারীর মাধ্যমে মধ্যযুগের কৌলিন্য প্রথা ও পুরুষ শাসিত সমাজের অকথ্য অত্যাচারের কথা অত্যন্ত জীবন্ত।

খুল্লনার বিবাহে যে সকল এয়োরা উপস্থিত হয় বলাই বাহুল্য, তারা সকলে বিবাহিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **শিতলি, পাতলি, শাকম্ভরী, সত্যভামা, রোহিনী, দ্রৌপদী, ইমলা, বিমলা, সরস্বতী, কমলা, ইন্দুমতি, তারা, রুক্মিনী , রত্না** প্রভৃতি। খুল্লনার বিবাহাচারের পূর্বে দুর্গার ঘট স্থাপন করা হয়েছে। এদের দ্বারা মনে হয়, উচ্চবিত্ত বিবাহিত কুলবধূদের মধ্যে দুর্গা বা চণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে রুক্মিনী জলসাধতে সুন্দর কাঁচুলি পরিধান করে এবং চুলের খোপায় চাঁপা ফুল গোঁজে। বিবাহাদিতে উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যে সাজ-সজ্জার রীতি প্রচলন ছিল। কবি তাদের নাম উল্লেখ করে সেই সাজ-সজ্জার বিবৃতি দিয়েছেন —

''হরি হরি রাইহ জানাও প্রতি ঘরে ঘরে।
শিতলি পাতলি রাইহ সাধুর মন্দিরে জাইহ
জারে তোরা জল সাধিবারে।।
শাকম্ভরী সত্তভামা রোহিনী দ্রৌপদী রামা
সকলের মাথায়ে দুর্গার ঘটবারা।
ইমলা বিমলা সরস্বতী কমলা
ইন্দুমতি আর তারা।।
রুক্মিনী চলিয়া জায়ে কাচুলি পহ্রিয়া গায়ে
খোপাভরি পহ্রে চাঁপার ফুল।''[২৯৩]

দক্ষিণ পাটনের রানী **নিলা**। তার স্বামী রাজা শালবান। তার সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের শর্ত স্বরূপ ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত অর্ধরাজ্য ও তার কন্যা সুশীলাকে বিবাহ কথার উত্থাপন করে। সেই মুহূর্তে নীলারানীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে তার রানীর মর্যাদাবোধটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সে শ্রীমন্তকে জানিয়ে দেয় যে, যুদ্ধে মৃত সৈন্যরা তার ভাই ও গুরুজন তুল্য। তাই সে একবছর তিলকুশ স্পর্শ করবে না। এই অবস্থায় শ্রীমন্তের শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। সে শ্রীমন্তকে বলে —

''জিয়াইঞা দেহ বাছা জত সেনাগণ।
তবে বিভা দিব বাছা শুনহ বচন।।''[২৯৪]

সুতরাং নীলারানীর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী দেবী চণ্ডী পুনরায় মৃত সৈন্যদের জীবিত করতে বাধ্য হয়। অতঃপর তার কন্যার সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ স্থির হয়। সে সমস্ত এয়োদের সঙ্গে জামাতা শ্রীমন্তকে বরণ করে এবং বিবাহাচার সম্পন্ন করে। এখানে তার রানী সত্তার সঙ্গে সামাজিক মাতৃসত্তাটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনলে সে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। কন্যার শ্বশুরালয়ে যাত্রা এবং তার কাছে অপ্রত্যাশিত দাম্পত্য জীবনের কথা ভেবে মাতা নীলারানীর দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার অন্ত নেই। তাই সে বলে —

''দুষ্ট বিধাতা লেখন কৈল কি।
দুখ পাইলাম বড় বিভা দিঞা ঝি।।''[২৯৫]

বাঙালী মাতাদের মত নীলারানীর কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দুঃখ, কষ্ট ও আক্ষেপের শেষ নেই।

শ্রীমন্ত বিবাহ করে পিত্রালয়ে আগমনের বার্তা শুনে যে সকল এয়ো তাকে বরণ করতে এসেছে তারা সামাজিক রীতি উন্মোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা হল **হিরাবতী, নিলাবতী, তারাবতী, হরিপ্রিয়া, চন্দ্রমুখী** ও **মালতী**। শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনার সঙ্গে তারা

নদীর তীরে যায়। এদের দ্বারা খুল্লনার আভিজাত্য বোধ এবং শুভাগমনের বিভিন্ন রীতির চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

সে যাইহোক, মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বহু ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তারা অনেকেই পুরাণ পরিচিত। তা সত্ত্বেও পুরাণে প্রচলিত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বাইরেও তারা মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে উঠেছে। দেব চরিত্রগুলি পুরাণের সঙ্গে বাস্তব অনুভূতির ধুলা মাখিয়ে নিয়েছে। আর লৌকিক চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে বিচিত্র গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক ভাবে বেশি অন্বিত হয়েছে। মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দুই প্রকারের চরিত্রের (দেব ও মানব) মধ্যে নারী চরিত্ররা বেশি জীবন্ত। মানব পুরুষ চরিত্রগুলি অধিকাংশ তাদের পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। তার প্রধান চরিত্রের তুলনায় অপ্রধান চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের বলে মনে হয়। তাতে কবি চরিত্র সৃষ্টিতে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। শুধু চরিত্র সৃষ্টিতেই নয়, তাঁর কবি প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পেতে কাব্যটির সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি বড় হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। E. M. Forster; Aspects of the Novel; Penguin Books, Reprinted, 1964, p. 73.

২। Id; p. 75.

৩। S. H. Butcher's translated; Aristotle's Theory of Poetry and fine Art, Kalyani Publishers, Reprented, 2012, Chap. XV, p. 53.

৪। Id; p. 53.

৫। Id; p. 53-55.

৬। Id; p. 55.

৭। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ; কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচণ্ডী (ভূমিকা), উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সংস্করণ, ২০ মার্চ, ১৯৬২, ৫০ তম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৮, পৃ: ৩৪-৩৫।

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭।

৯। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৬, পৃ. ১।

১০। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত; ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০ মণ্ডল, ১৪৬ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯।

১১। তদেব, পৃ. ৬২০।

১২। সুকুমার সেন; ভারত কোষ (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক আদিত্য ওহদেদার, কালীদাস ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, নির্মল কুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ২৭৩।

১৩। দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, মহাভারত (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ), ভীষ্মপর্ব (১৭ নং খণ্ড) শ্রীহরি দাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত টীকা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

১৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৮৬ তম অধ্যায়), নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৪৬।

১৫। তদেব; পৃ. ৩৪৯।

১৬। তদেব; পৃ. ৩৫৬।

১৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত অগ্নিপুরাণ (৫০ অধ্যায়), নবভারত পাবলিশার্স, নবভারত প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৯, পৃ. ৯২।

১৮। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী-ভাগবতী (বঙ্গানুবাদ), বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেশিন যন্ত্রে নটবর চক্রোবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩১ সাল, পৃ. ২৫৩।

১৯। সুকুমার সেন; ভারতকোষ (৩য় খণ্ড), সম্পাদক আদিত্য ওহদেদার, কালীদাস ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, নির্মল কুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ২৭৩।

২০। তদেব।

২১। তদেব।

২২। সুকুমার সেন; বঙ্গভূমিকা, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ১২৯।

২৩। সুকুমার সেন; ভারতকোষ (৩য় খণ্ড), সম্পাদক আদিত্য ওহদেদার, কালীদাস ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, নির্মল কুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ২৭৩।

২৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৭২৩।

২৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩।

২৬। তদেব; পৃ. ৯।

২৭। তদেব; পৃ. ১৫।

২৮। তদেব; পৃ. ১৬।

২৯। তদেব; পৃ. ২১।

৩০। তদেব; পৃ. ২৩।

৩১। তদেব; পৃ. ২৫।

৩২। তদেব।

৩৩। তদেব।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বাতায়নিকের পত্র, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ঠম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৩১২।

৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩।

৩৬। তদেব; পৃ. ৫০।

৩৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ: ৪৫৪।

৩৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫৭।

৩৯। তদেব; পৃ. ৫৮।

৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ঠম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৪৩৯-৪০।

৪১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭৭।

৪২। তদেব; পৃ. ৭৯।

৪৩। তদেব; পৃ. ৮০।

৪৪। তদেব; পৃ. ৯৬।

৪৫। তদেব; পৃ. ১০০।

৪৬। তদেব; পৃ. ১০৬।

৪৭। তদেব; পৃ. ১০৭-১০৮।

৪৮। তদেব; পৃ. ১০৮।

৪৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন সংস্করণ, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬, পৃ: ১৫।

৫০। ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (প্রথম খণ্ড), দে'জ, নব সংস্করণ ও মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ: ৩৫।

৫১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৯।

৫২। তদেব; পৃ. ১১০।

৫৩। তদেব; পৃ. ১২৯।

৫৪। তদেব; পৃ. ১১৫।

৫৫। পল্লব সেনগুপ্ত; লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ: ৭১।

৫৬। মিহির চৌধুরী কামিল্যা; আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ: ২০৬।

৫৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৫৮। তদেব; পৃ. ১৫৫।

৫৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ঠম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৪৪০।

৬০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৭।

৬১। তদেব; পৃ. ১৬৩।

৬২। তদেব; পৃ. ১৬৮।

৬৩। তদেব; পৃ. ১৭৪।

৬৪। তদেব।

৬৫। তদেব।

৬৬। তদেব; পৃ. ১৭৬।

৬৭। তদেব; পৃ. ১৮৬।

৬৮। তদেব; পৃ. ২২১।

৬৯। তদেব; পৃ. ২৩১।

৭০। তদেব; পৃ. ২৩২।

৭১। তদেব; পৃ. ২৫৪।

৭২। তদেব; পৃ. ২৭৪।

৭৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী (প্রথম ভাগ), সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, সাহিত্যলোক সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৭, পৃ: ১৭৫।

৭৪। সুকুমার সেন; 'লঙ্কাহ্রদ- হ্রদে চণ্ডী কমলে-কামিনী?' প্রবন্ধ, প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড — বিচিত্র দেবতা), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, ১৩৯১/১৯৮৪, পৃ: ৬৮।

৭৫। তদেব; পৃ. ৭০।

৭৬। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭ , পৃ: ৪১৪।

৭৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬৩।

৭৮। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

৭৯। তদেব; পৃ. ৪।

৮০। তদেব; পৃ. ৫।

৮১। তদেব; পৃ. ৮।

৮২। তদেব; পৃ. ৯।

৮৩। তদেব।

৮৪। তদেব; পৃ. ১০।

৮৫। তদেব; পৃ. ১১।

৮৬। তদেব; পৃ. ১৩।

৮৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শক্তিপূজা, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন, বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ. ৩১৭।

৮৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩।

৮৯। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য; হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ: ৫৭।

৯০। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত; কুমার সম্ভব, পঞ্চম সর্গ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ), বসুমতী সংস্করণ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৭ পৃ. ৮০।

৯১। তদেব; তৃতীয় সর্গ, পৃ. ৫০।

৯২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৪।

৯৩। শশীভূষণ দাশগুপ্ত; বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা: লি:, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২, পৃ: ১৬।

৯৪। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য; হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ: ৪৭।

৯৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬।

৯৬। তদেব; পৃ. ২৪।

৯৭। সুকুমার সেন; 'শিব-ঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী-দেবী' প্রবন্ধ, প্রবন্ধাবলী (বিচিত্র দেবতা-প্রথম খণ্ড), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯১, পৃ. ১৫৪।

৯৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৬।

৯৯। তদেব; পৃ. ৪৭।

১০০। তদেব; পৃ. ৫০।

১০১। ক্ষেত্র গুপ্ত; কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, তৃতীয় সংস্করণ, ১লা আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৬৯।

১০২। সুকুমার সেন; প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৫০, পুনর্মুদ্রণ, ১৮৯৪, পৃ. ৪৭।

১০৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১।

১০৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কবিকঙ্ক ণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, প্রথম ভাগ, সাহিত্যলোক, আশ্বিন ১৪০৭, পৃ: ২০২-২০৩।

১০৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২।

১০৬। তদেব; পৃ. ৩।

১০৭। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত; ঋগ্বেদ-সংহিতা (অষ্টমোহষ্টকঃ), হাওড়া শহরে পৃথিবীর ইতিহাস মুদ্রাযন্ত্রে ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মুদ্রিত, দশম মণ্ডল, ১১ অনুবাক, ১২৯ সূক্ত, ১৩৩২ সাল, পৃ. ৬৩৯।

১০৮। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত; ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, প্রথম

প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৬২৪।

১০৯। সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত; সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, অষ্টম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭১, পৃ. ৭৬১।

১১০। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কবিকঙ্কণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, প্রথম ভাগ, সাহিত্যলোক, আশ্বিন ১৪০৭, পৃঃ ২২৯।

১১১। তদেব; পৃ. ২৩০।

১১২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১।

১১৩। তদেব।

১১৪। তদেব; পৃ. ১২।

১১৫। তদেব।

১১৬। তদেব; পৃ. ৫৩।

১১৭। তদেব; পৃ. ৫৪।

১১৮। তদেব; পৃ. ৯১।

১১৯। তদেব; পৃ. ১২৩।

১২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ঠম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ৪৩৪।

১২১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩৯।

১২৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩০।

১২৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯১।

১২৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২।

১২৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫০।

১২৯। তদেব; পৃ. ৫৫।

১৩০। তদেব; পৃ. ৫৬।

১৩১। তদেব; পৃ. ১২৩।

১৩২। তদেব; পৃ. ১২৭।

১৩৩। তদেব।

১৩৪। তদেব; পৃ. ১৮৯।

১৩৫। তদেব; পৃ. ২১৯।

১৩৬। তদেব; পৃ. ৮০।

১৩৭। তদেব; পৃ. ৮২।

১৩৮। তদেব; পৃ. ১৮৬।

১৩৯। তদেব; পৃ. ২৭৪।

১৪০। তদেব; পৃ. ৩০১।

১৪১। তদেব; পৃ. ৭।

১৪২। তদেব; পৃ. ১৫।

১৪৩। তদেব; পৃ. ১২৫।

১৪৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮৫তম অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৪৩।

১৪৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৩।

১৪৬। অতুল সুর; বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ২৫৮।

১৪৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪।

১৪৮। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী-ভাগবত (বঙ্গানুবাদ), বঙ্গবাসী-প্রেস থেকে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩১, পৃ. ১১।

১৪৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৭।

১৫০। তদেব; পৃ. ১৮৭-১৮৮।

১৫১। তদেব; পৃ. ১৮৮।

১৫২। তদেব; পৃ. ২৭১।

১৫৩। তদেব; পৃ. ৫৯।

১৫৪। তদেব; পৃ. ৬৪-৬৫।

১৫৫। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, পরিবর্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ: ১৭৫।

১৫৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৯।

১৫৭। তদেব; পৃ. ৭০।

১৫৮। তদেব; পৃ. ৭৩।

১৫৯। তদেব; পৃ. ৭৮।

১৬০। তদেব; পৃ. ৭৭।

১৬১। তদেব; পৃ. ৭৯।

১৬২। তদেব; পৃ. ১০২।

১৬৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২২।

১৬৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৬।

১৬৫। তদেব; পৃ. ১০৯।

১৬৬। তদেব; পৃ. ১১৪।

১৬৭। তদেব; পৃ. ১৫০।

১৬৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৬২।

১৬৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২২।

১৭০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬৭।

১৭১। সুকুমার সেন; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, পাদটীকা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ: ৪৯।

১৭২। রামগতি ন্যায়রত্ন; বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২ সাল, পৃ. ৯৭-৯৮।

১৭৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭১-৭২।

১৭৪। তদেব; পৃ. ৭১।

১৭৫। তদেব; পৃ. ৭৩।

১৭৬। তদেব; পৃ. ৮০।

১৭৭। তদেব; পৃ. ৯২।

১৭৮। তদেব।

১৭৯। তদেব; পৃ. ৯৭।

১৮০। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য; ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ: ৩৭।

১৮১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৫।

১৮২। তদেব; পৃ. ১৪৩।

১৮৩। তদেব।

১৮৪। তদেব; পৃ. ১৫৬।

১৮৫। তদেব; পৃ. ১৬৮।

১৮৬। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ: ৪৩৪।

১৮৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১২৪।

১৮৮। তদেব।

১৮৯। তদেব; পৃ. ১৩০।

১৯০। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ: ৪৫৪।

১৯১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩১।

১৯২। তদেব।

১৯৩। তদেব; পৃ. ১৩৪।

১৯৪। তদেব; পৃ. ১৩৭-১৩৮।

১৯৫। তদেব; পৃ. ১৫৬।

১৯৬। তদেব; পৃ. ১৬৬।

১৯৭। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীস্টীয় ১৪৯৩ — ১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ (নতুন সংস্করণ), ২০০৬-২০০৭, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯২।

১৯৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১১।

১৯৯। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মহর্ষি দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৯৩ অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ: ৩৬৬-৬৭।

২০০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬।

২০১। তদেব; পৃ. ১৪৭।

২০২। তদেব; পৃ. ৫৮।

২০৩। তদেব; পৃ. ৬৭।

২০৪। তদেব; পৃ. ৯৩।

২০৫। তদেব; পৃ. ১৭৭।

২০৬। তদেব; পৃ. ১৭৯।

২০৭। তদেব; পৃ. ১৯৩।

২০৮। তদেব; পৃ. ১৯৪।

২০৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২৮।

২১০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৯৭।

২১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২৯।

২১২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২০৪।

২১৩। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী; 'মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী' প্রবন্ধ, প্রতিভা, সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩২০, পৃ. ২৯৩।

২১৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১২।

২১৫। তদেব; পৃ. ২২০।

২১৬। তদেব; পৃ. ২৩৯।

২১৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪২৯।

২১৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪০।

২১৯। তদেব; পৃ. ২৪৩।

২২০। তদেব; পৃ. ২৪৫।

২২১। তদেব; পৃ. ২৪৭।

২২২। তদেব; পৃ. ২২২।

২২৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৮।

২২৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৯।

২২৫। তদেব; পৃ. ২৭৭।

২২৬। তদেব; পৃ. ২৭৮।

২২৭। তদেব; পৃ. ৩৬৩।

২২৮। তদেব; পৃ. ৩৬৫।

২২৯। তদেব; পৃ. ৩৬৮।

২৩০। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৯।

২৩১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৮৬।

২৩২। তদেব; পৃ. ২৮৭।

২৩৩। তদেব।

২৩৪। তদেব।

২৩৫। তদেব; পৃ. ২৮৮।

২৩৬। তদেব; পৃ. ২৯৪।

২৩৭। তদেব; পৃ. ২৯৫।

২৩৮। তদেব; পৃ. ৩১৫।

২৩৯। তদেব; পৃ. ৩৬৫।

২৪০। তদেব; পৃ. ৩৬৬।

২৪১। রামগতি ন্যায়রত্ন; বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২ সাল, পৃ. ৯৮।

২৪২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮২।

২৪৩। তদেব; পৃ. ১৮৩।

২৪৪। তদেব; পৃ. ১৯৩।

২৪৫। তদেব; পৃ. ২০৫।

২৪৬। তদেব; পৃ. ২২২।

২৪৭। তদেব; পৃ. ২২৪।

২৪৮। তদেব; পৃ. ২২৫।

২৪৯। তদেব; পৃ. ২৩৪।

২৫০। তদেব।

২৫১। তদেব; পৃ. ২৬০।

২৫২। তদেব; পৃ. ২৬২।

২৫৩। তদেব; পৃ. ২৬৪।

২৫৪। তদেব; পৃ. ২৮৮।

২৫৫। তদেব; পৃ. ১৯৫-১৯৬।

২৫৬। তদেব; পৃ. ১৯৭।

২৫৭। তদেব; পৃ. ২২৪।

২৫৮। তদেব।

২৫৯। তদেব; পৃ. ২২৫।

২৬০। তদেব; পৃ. ২২৭।

২৬১। তদেব; পৃ. ২৩৪।

২৬২। তদেব; পৃ. ২৪৮।

২৬৩। তদেব; পৃ. ২৪৯।

২৬৪। তদেব; পৃ. ২৫৬।

২৬৫। তদেব; পৃ. ২৮৬।

২৬৬। তদেব; পৃ. ২৮৭।

২৬৭। তদেব; পৃ. ২৯৪।

২৬৮। তদেব; পৃ. ৩৬৫।

২৬৯। তদেব; পৃ. ১৮৪।

২৭০। তদেব; পৃ. ১৮৫।

২৭১। তদেব; পৃ. ১৯৪।

২৭২। তদেব; পৃ. ১৯৮।

২৭৩। তদেব; পৃ. ১৯৯।

২৭৪। তদেব; পৃ. ২১৫।

২৭৫। তদেব; পৃ. ২৪০।

২৭৬। তদেব; পৃ. ২৪৭।

২৭৭। তদেব; পৃ. ২৮৭।

২৭৮। তদেব; পৃ. ৩১৭।

২৭৯। তদেব; পৃ. ৩৪৫।

২৮০। তদেব; পৃ. ২২৫।

২৮১। তদেব।

২৮২। তদেব; পৃ. ২৩৪।

২৮৩। তদেব; পৃ. ২৪২।

২৮৪। তদেব; পৃ. ২২২-২২৩।

২৮৫। তদেব; পৃ. ২২৩।

২৮৬। তদেব।

২৮৭। তদেব; পৃ. ৩৫৭।

২৮৮। তদেব; পৃ. ৩৬১।

২৮৯। তদেব; পৃ. ৩৬৬।

২৯০। তদেব; পৃ. ১৯৯।

২৯১। তদেব; পৃ. ২১১।

২৯২। তদেব; পৃ. ২০১।

২৯৩। তদেব; পৃ. ২০৬।

২৯৪। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

২৯৫। তদেব; পৃ. ৩৬২।

——oo——